প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোং

১নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by

Gobardhan Pan,

At the Gobardhan Press,

209, Cornwallis Street, Calcutta

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সে দিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখকসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব

করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন রূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রতপ্রভাতকলরবে মুখরিত

করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটী আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম; সেই জন্য আজ মনে মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সে দিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কথনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চির-দিনের নহে। সে দিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্য মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীরগম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্য-পথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সে দিন আর

নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোন দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে কোন দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত-প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ চালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে।

বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিয়াছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভেরেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স্-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত হীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানব-জীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসা-

মাণ্ড কাজ করিলেন তাঁহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজীতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজী সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটী অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার

যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছু নাই ; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখন সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভা-বলে যে কার্য্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবি-রশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটী ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখায় প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত

রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল—তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গ-দর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর বূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোন দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং

কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপ্‌রি-পাওনা—যেন যথালাভের মত।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না; সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই

লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথকীকরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতাগঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোন এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন —বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা

অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা প্রায় সাহিত্যের এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহা-তেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন যে, ইহা কোন সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরিহরি, মরিমরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্য-নির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না; সর্ব্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকে বাক্প্রাচুর্য্যে

এবং কল্পনাকুহককে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক-পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন! একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সঙ্কোচ; একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস এবং সংস্কারের অন্ধতা; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। (দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।) যে বন্যার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বন্যার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন বঙ্কিম হাস্যরসে

সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটী রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটী বোধশক্তি আছে যদ্দারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনি প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবলই প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ

করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটী ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভাল স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর

মধ্যে একটী ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটী আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটী সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটী উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটী ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটী শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন,

সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন দৃশ্যটী অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক্ ঠিক সুরুচি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটী করিয়া তার চড়াইয়া আজ

তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়-সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটী কোমল প্রসন্নতা, একটী সর্ব্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্ত্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজ-নৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে সকল

ঘটনা যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্ব-প্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটী অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা, তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত

তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যস্থর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়-সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটী কোমল প্রসন্নতা, একটী সর্ব্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্ত্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে এক-বার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজ-নৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে সকল

ঘটনা যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃ-ভাষাকে সর্ব্ব-প্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটী অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা, তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত

করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষে পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

১৩০০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কথকঠাকুর।

‘লাক বড় পেটুক’!

[ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা।]

১

শরৎকাল, আশ্বিন মাস, কৃষ্ণপক্ষ, সম্মুখে মহালয়া অমাবস্যা। পরে দেবীপক্ষ পড়িবে, দেবীর আবির্ভাব হইবে, বঙ্গবাসী আনন্দে উৎফুল্ল। এখনও ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কূলে কূলে জল, স্রোতস্বতী ভাগীরথী অবিশ্রান্তবেগে ছুটিতে ছুটিতে অনন্তস্রোতে গিয়া মিশিতেছে। এই সময় এক দিবস অপরাহ্ণে কাঁঠালপাড়ার রাধাবল্লভজীউর ঘাটের উত্তর দিকে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বৃহৎ চন্দ্রাতপের নীচে অনেকগুলি লোক বসিয়া কথকতা শুনিতেছে। গ্রামের এক বর্ষীয়সী স্বর্গারোহণ করিবেন, সেই উপলক্ষে তাঁহাকে রামায়ণ শুনান হইতেছে। গ্রামের প্রাচীনগণ আনন্দ ছাড়িয়া ঐ স্থানে হরিনাম শুনিতেছেন; নিষ্কর্ম্মা যুবকগণ তাসখেলা গানবাজনা ত্যাগ

করিয়া ও বালকগণ ছুটাছুটি ছাড়িয়া ঐ স্থানে কথকঠাকুরের মুখ-পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

একখানি চৌকির উপর পুরু গালিচাতে কথকঠাকুর বসিয়া আছেন। শীর্ণ ও শুষ্ক শরীর, দেহের মধ্যে কোনও স্থানে সরু মোটা নাই; নাসিকাটি বড় লম্বা ও তাহার উপরের ফোঁটাটিও তদ্রূপ লম্বা; নাসিকার উভয় পার্শ্বে চক্ষু দুটি এত ক্ষুদ্র যে, দেখিলে ডেঁয়ো পিঁপড়ে মনে হয়। মস্তক কেশহীন, কণ্ঠে তুলসীর মালা, গলায় একছড়া মালা, গাত্রে নামাবলী, সম্মুখে একখানি পুঁথি, উহাতে যথেষ্ট চন্দনের চিহ্ন,—বোধ হয় কথকঠাকুর প্রত্যহ উহার পূজা করিতেন; অথবা সরস্বতী-পূজার সময় উহার উপর প্রচুর-পরিমাণে চন্দন ঢালিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি তাকিয়া; কথকঠাকুর বক্তৃতা করিতে করিতে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, এক একবার ঐ তাকিয়াতে ঠেস দিতেছেন। তাঁর হাত মুখ নাড়া বড় রহস্যজনক, বিশেষতঃ শ্বেত সুবৃহৎ দন্তগুলির জন্য আরও রহস্য-জনক। ইনি স্থানীয় কথক, সময়াভাবে স্থানান্তর হইতে কথক আনা হয় নাই।

বেদীর বামপার্শ্বে কতকগুলি বালক বসিয়া কথকঠাকুরের মুখ প্রতি চাহিয়া আছে। তন্মধ্যে একটী বালককে দেখিলে অসামান্য বলিয়া বোধ হইবে। রূপবান্ বলিয়া নহে, তাহার মুখে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, সেই জন্য তাহাকে সকলেই লক্ষ্য করিত। তাহার বয়ঃক্রম দশ, এগার, কি বার বৎসর হইবে। উপনয়ন হইয়াছে; এমন কি, বিবাহ হইয়াছে। বালিকাপত্নী সকলের কোলে

কোলে বেড়াইত। বালকটি গৌরবর্ণ ক্ষীণদেহ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, মাথায় একরাশি কোঁকড়া কোঁকড়া কাল চুল। নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। চক্ষু দুইটি অসাধারণ উজ্জ্বল, বড় চঞ্চল, এবং তাহার দৃষ্টি তীব্র। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও চাপা; তাহাতে সর্ব্বদা হাসি থাকিত—(এমন কি, তাঁর মৃত্যুর সময়েও ঐ হাসি দেখিয়াছি)। বালকের গায়ে একটা সাদা জামা ছিল; shirt নহে, যাহাকে সেকালে পিরাণ বলিত। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র, ইঁহারই পিতামহীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কথকতা হইতেছিল। তিন সপ্তাহকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন তাঁহার পিতামহী স্বর্গারোহণ করেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের আশে পাশে চার পাঁচটি বালক বসিয়া ছিল;—কেহ বা বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই লেখকও ঐ দলে বসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকের মুখপ্রতি চাহিতেছেন, আর বয়স্যদিগকে কি বলিতেছেন, তাহারা টিপি টিপি হাসিতেছে। কথকতা এবং সঙ্গীত তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ঐ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, আর বালকেরা হাসিতেছিল। এই সময়ের দুই একটা কথা আমার অদ্যাপি স্মরণ আছে। ঐ কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক বলিয়া নিম্নে প্রকটিত করিলাম।—

বঙ্কিমচন্দ্র। কথকঠাকুরের নাকটা বড় পেটুক।

একটি বালক। মানুষ পেটুক শুনিয়াছি, মানুষের নাক পেটুক, এমন ত কখনও শুনি নাই।

বঙ্কিম। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, শুন; কথক-

ঠাকুরের নাকটা ঠোঁট ছাড়াইয়া গালের ভিতর উঁকি মারিতেছে! দেখিতেছ ত?

বালক। হাঁ।

বঙ্কিম। কেন বল দেখি?

বালক। তা' জানিব কেমন করে'?

বঙ্কিম। কথকঠাকুর যখন আহার করেন, তখন নাকটা গালের ভিতর হইতে আহারের দ্রব্যাদি চুরী করিয়া খায়, কথকঠাকুর উহা জানিতে পারেন না।

এই কথায় বালকেরা উচ্চহাসি হাসিল, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে ধমক-ধামক করিতে লাগিলেন। নিকটে দুই একটি প্রাচীন যাঁহারা ঐ কথা শুনিয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধমকাইবেন না, বড় সরস কথাটা হইয়াছে, কথা ভাঙ্গিলে বলিব।" বাস্তবিক নাকটা এত লম্বা যে, প্রায় মুখের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র তাহা লইয়া রহস্য করিতেছিলেন। নিকটস্থ এক জন প্রাচীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এখন ত কথকঠাকুর কিছু আহার করিতেছেন না, তবে নাকটা কি খাবার লোভে মুখের ভিতর উঁকি মারিতেছে?" প্রত্যুৎপন্নমতি বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এখন নাক কথকঠাকুরকে খাওয়াইতেছে, নাকের সরস নস্য কথকঠাকুরের গালের ভিতর ফোঁটা ফোঁটা ঢালিতেছে, কথকঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে খাইতে অস্বীকার করিতেছেন, এবং মুহুর্মুহুঃ গামছা দিয়া ঠোঁট মুছিতেছেন।" এই কথায় বালকেরা ও নিকটস্থ দুই জন প্রাচীন বড় হাসি হাসি-

লেন, সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না।

একদিন কথকঠাকুর একটা গীত (মদন মদ ঈশ ইত্যাদি) গাহিতে গাহিতে অনেক প্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কাণ বন্ধ কর্ দেখি।" আমি তাহাই করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গান শুন্‌তে পাচ্ছিস্ ?" আমি উত্তর করিলাম, "একটু একটু পাচ্ছি।"

বঙ্কিম। "আরও জোরে কাণ বন্ধ কর্।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি তাহাই করিয়া বলিলাম, "এখন কিছুই শুনিতে পাই না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একবার কথকঠাকুরের মুখপানে চা দেখি!" আমি কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বালক বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন ; কিন্তু সম্মুখে আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের চোখরাঙ্গা ভুরুভাঙ্গা দেখিয়া আমরা মাথা হেঁট করিলাম। বোধ হয়, এ স্থলে আর বুঝাইতে হইবে না যে, যদি এক জন বধির কোনও মুদ্রাদোষবিশিষ্ট গায়কের গান শুনিতে বসেন, তিনি গান শুনিতে পাইবেন না, কেবল গায়কের হাত মুখ নাড়া, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও দন্তের নানারূপ বিকাশ দেখিয়া হাসিয়া উঠিবেন। আমার তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ঐরূপ দুষ্টামী করিতেন, যদি কোনও গায়কের গান ভাল না লাগিত, আপনি আপনার কান টিপিয়া গায়কের মুখ-প্রতি চাহিয়া

থাকিতেন, এবং অপরকেও ঐরূপ করাইতেন। হাকিম হইয়া যখন উকীল মোক্তারের বক্তৃতা শুনিতেন, তখন কান টিপিয়া তাহাদের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন কি না, সে বিষয়ে কোনও সংবাদ আমরা পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত প্রকরণ কিছুদিন তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এই ক্ষুদ্র লেখকও আবশ্যক হইলে ঐ প্রকরণ অদ্যাপি অবলম্বন করিয়া থাকেন!

তাঁহার একটি জমীদার আত্মীয়ের নাক বড় লম্বা ছিল, তিনি তাঁহার সহিত তামাসা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পেট ভরে' খেতে পান ত?"

"কেন? পেট ভরে' খেতে পাব না কেন?"

"বলি, আপনার নাকটার জন্য কিছু ব্যাঘাত হয় না ত? নাকটা কিছু ভাগ লয় না ত?"

ইহা শুনিয়া জমীদার বাবু খুব হাসিয়াছিলেন! ঐরূপ কথার দুষ্টামী তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল; বাল্যকালে কিংবা কোনও কালে বাক্যে ভিন্ন কার্য্যে তাঁহার দুষ্টামী ছিল না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বালক বঙ্কিমচন্দ্র কথকঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতেন, এবং নানা প্রশ্ন করিতেন। কথকঠাকুর তেমন পণ্ডিত ছিলেন না, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, সুতরাং বিরক্ত হইতেন। এইরূপ প্রতিদিন করাতে কথকঠাকুর একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজকে (সঞ্জীবচন্দ্র) বলিলেন, "আপনার এ ভাইটি আমায় বড় বিরক্ত করিয়া থাকে।" বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজের তখনও কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নাই,—তিনিও একজন প্রতিভাশালী

যুবক ছিলেন,—হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বালক শিখিবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করে।" সেই অবধি বঙ্কিমচন্দ্র আর কথক-ঠাকুরকে কোনও প্রশ্ন করিতেন না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চেয়ার অথবা টুল লইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিতেন; পিতামহীর গঙ্গাবাস উপলক্ষে চেয়ার ও টুলের অভাব ছিল না। তিনি বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এখন আর তিনি রহস্যপ্রিয় বালক নহেন, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গাম্ভীর্য্যশালী প্রবীণের স্বভাব পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাতীরে বাসকালে প্রথম দুই সপ্তাহ কৃষ্ণপক্ষ ও শেষ সপ্তাহ দেবীপক্ষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন সপ্তাহ কাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীর তীরে বসিতেন, কখনও আকাশে সন্ধ্যা-তারা উঠিতেছে—তাহাই দেখিতেন, কখনও বা আকাশে কাস্তের ন্যায় চাঁদ উঠিতেছে—(দেবীপক্ষ) তাহাই দেখিতেন, সঙ্গিগণ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তারা গুণিত, "ঐ একটা, ঐ দুটো, রাখাল বল্ দেখি, তোর আমার ক' চোক্?" সে উত্তর করিত, "চার চোক্।" "ঐ দেখ, শত্রু শালার এক চোক্।" এইরূপে অন্যান্য বালকগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিত, কিন্তু প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথীতীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছে, দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ গাঢ় অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল এপারের ও পারের নৌকাশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোগুলি মনুষ্য-জীবনের আশার ন্যায় একবার নিবিতেছে, একবার

জ্বলিতেছে, আর দুই একখানি পান্‌সী অন্ধকারে কলিকাতার দিকে বাহিয়া যাইতেছে, তাহাদের দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনা যাইতেছে। এই বাল্যস্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথা :—

"সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারক-হস্ত-জ্বালিত দীপ-মালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যান-কুসুমসমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশসমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। * * * নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।"—মৃণালিনী।

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"নবীন শরদুদয়ে ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকরপ্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগমে প্রহ্লাদিনী।"—মৃণালিনী।

২

এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি অপ্রশস্ত খাল ছিল। বর্ষা-কালে ভাগীরথীর জলে উহা পূর্ণায়তন হইয়া পূর্ব্বদিকে একটি বিলে মিশিত; খালটি এমন অপ্রশস্ত যে, উভয় পার্শ্বের গাছের ডালের পাতায় পাতায় মিশিয়া ঐ খালের উপর পাতার ছাদ হইয়াছিল, সে জন্য খালটি সর্ব্বদা অন্ধকারময় থাকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্কুলে (Hugly College) যাইবার জন্য একটি ছোট ডিঙ্গী নৌকা

ছিল। তিনি বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্বদাই স্কুলের ছুটী হইলে, বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, বরাবর ঐ নৌকাতে ঐ খালে প্রবেশ করিতেন; এই লেখকও ঐ নৌকাতে থাকিতেন; কেন না, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঐ স্কুলে যাইতেন। তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে, উহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পাখী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্দ্ধনিমজ্জিত, নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহারা নানাবর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন, ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।

তখন তাঁহার বয়স তের কি চৌদ্দ হইবে। একদিন গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সদরবাটীতে আসিয়া তাঁহার নৌকার মাঝিকে ও দ্বারবান্‌কে উঠাইলেন, (পূর্ব্বে ইহা বন্দোবস্ত ছিল) পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বর্ষাকাল, পূর্ণিমারাত্রি, চন্দ্রমা মধ্যগগনে বিরাজ করিতেছেন, নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে, পৃথিবী আলোকময়ী, নিস্তব্ধ; একটা কুকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বালক কবির সেই অন্ধকারময় খালে বিচরণ করিবার উপযোগী সময় বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে নৌকায় উঠিলেন, কিছু দূর ভাগীরথী বাহিয়া গিয়া খালে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে জলোচ্ছ্বাসে খাল পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার এই খালে বিচরণের কথা

পৌরজনের মধ্যে কেহ জানিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার অনুজ (এই লেখক) যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে শয়ন করিতেন, তিনিই জানিতেন, কিন্তু ভয়ে ঐ কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। অনুজ কিছু দূর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সাকৃরেত; 'সাধুরঞ্জন' ও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারীর সহিত কবিতা লেখার যুদ্ধ করিতেন। নিশীথে খাল-বিচরণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই কলম-জাৎ হইল, যথা :—

"মহারণ্যে অন্ধকার গভীর নিশায়।
নির্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকার, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি।
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে।
কল কল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি যেন বা স্বপন।
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধর-কর।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে নীল জলোপর॥"

—ললিতা ও মানস।

৩

যে গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাটী, তাহার আশে পাশে বড় বড় গ্রাম, আর সম্মুখে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে তিন চারিটী বড় বড় নগর ছিল, তাহাতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সে কারণ দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন ভাগীরথীবক্ষে বড় সমারোহ হইত; এক্ষণে কালমাহাত্ম্যেই হউক, অথবা দরিদ্রতা জন্যই হউক, সেরূপ সমারোহ আর নাই। ঐ সময় বিজয়ার দিনে বিকালে ফরাসডাঙ্গার নীচে অনেক নৌকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দশভুজার প্রতিমা লইয়া জাহ্নবী-বক্ষে বিচরণ করিত; কোনও নৌকাতে যাত্রা হইত, কোনও নৌকাতে নাচ হইত, আর এই সকল নৌকার কিঞ্চিৎদূরে অর্থাৎ বাহির-নদীতে অনেকগুলি ছত্রহীন বাচের নৌকা বাচ খেলাইয়া বেড়াইত,—ইহাকেই Boat Race বলে। কাহারও বার দাঁড়, কাহারও ষোল দাঁড়। এই সকল নৌকা সন্-সন্ বেগে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং অন্যান্য নৌকার দাঁড়ীদিগের গাত্রে দাঁড়ের জল দিতেছে! দর্শকগণ দশভুজার প্রতিমা ভুলিয়া গিয়া এই বাচের নৌকাগুলির গতি দেখিতেছে, এবং বাহবা দিতেছে।

যখন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকাতে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতাদিগের সহিত ফরাসডাঙ্গায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সন্ধ্যা হইল। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটি শবদাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; একটি স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় প্রজ্জলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীগণ

তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যোবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই এরূপ হইল। নৌকাতে অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃ একটী গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে এই লেখক ছিলেন, তাহাকে চুপি চুপি ঐ গানটি শুনাইলেন; কেন না, তাঁহার অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন ঐ গানটি মল্লার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই; যথা :—

"হারালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিনী, কি রমণী ?"

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যের পুনরুদ্দীপন হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত—ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কলম ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ। বঙ্গকুল-কামিনীগণও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে দু চারি জন বঙ্কিম-চন্দ্রের বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপ-কথন হইত, কেহ যদি তাহা বিবৃত করিতে পারিত, তাহা হইলে, উহা যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সাদরে পঠিত হইত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই কথোপকথনে দেশী ও বিদেশী কাব্য ও নানা-শাস্ত্রের আলোচনা এবং নূতন পুস্তকাদির সমালোচনাও হইত। ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়গণ উপস্থিত থাকিলে চুটকি বিচারও চলিত। আবার এই কথোপকথনের মধ্যে শান্তিপুরের একটা ভূত কিরূপ সমারোহে তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সে গল্পও থাকিত; দীনবন্ধুর গল্প এবং নানাপ্রকার রহস্যের কথাও থাকিত। আমি কখনও এই কথোপকথন-বিষয়ে কিছু লিখিবার চেষ্টা করি

নাই। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে সময় আমার অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্কিম-প্রসঙ্গ দুই চারিটা প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে।

কথিত আছে যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত লিখিত হয়, প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুই একটা ঘটনা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোনও উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই। এ বয়সে সে সব কথার আলোচনায় নিজে তৃপ্তি পাই, তাই লিখি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধু ও পাঠকগণের সে সকল প্রসঙ্গ ভাল লাগিতে পারে, এই জন্য লিখি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটী হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে এক জন বিলাতী সাহেব উহার হেডমাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাস-পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময়, তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং পরে তাঁহার

অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমাদের বাসার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র মাঠে স্কুল ছিল। ঐ স্কুল-বাটীতেই তাঁহাদের বাসা ছিল। এখন সেখানে স্কুল নাই, সে মাঠে সরকারী বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময়ে মলেট সাহেব নামে এক জন হালুবরি সিভিলিয়ান মেদিনী-পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। টিড্ সাহেবের বিবির সহিত তাঁহার বিবির বিশেষ প্রণয় ছিল। টিড্ সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদিগকে ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে যাইতেন। মলেট সাহেবের বাটী আমাদের বাসার উত্তরে, মধ্যে কেবল একটা মাত্র উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়া বিবিদের সহিত গল্প করিতেন, ও তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়া-দৌড়ি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না, সে জন্য কখনও বলিষ্ঠও ছিলেন না।

এইরূপ প্রায় তিন বৎসর কাল বৈকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠীর মাঠে টেবিল-চেয়ার পড়িল, বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠীর ভিতর হইতে এক জন অপরিচিত সাহেব আসিয়া ছেলেদের

ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকেন নাই। বালক বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন ; পরে আর ঐ কুঠীতে যান নাই—টিড সাহেবের কুঠীতে গিয়াছিলেন বটে। ইহার দিন কয়েক পরেই পিতৃদেব কলিকাতার আলিপুরে বদলি হইলেন। এই সময় মলেট সাহেবের সহিত পিতৃদেবের দেখা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সাহেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিন বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতী পরিবারের সংস্রবে আসায় তাহার কোনও ফল ফলিয়াছিল কি না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।

মেদিনীপুর ত্যাগ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার মনে পড়ে। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁঠালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে এক জন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।

কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বিস্তর ভদ্রলোক আসিতেন। তন্মধ্যে এক জন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। যেটী ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। আর, বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের

রচিত। তখন তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বাটীতে "প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" পত্রিকা আসিত; উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র সে সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতেন।

একালে যেমন recitaion-এর একটা হুজুগ উঠিয়াছে, পুরস্কারের জন্য ছাত্রেরা ঘরে ঘরে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা তেমনিই আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে এক জন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদ-বধ" কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম! কতবার উহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই! বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন আশে-পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত। একদিন তিনি তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতে"র "গোপীভর্ত্তু বিরহবিধুরা কাচিদিন্দুবরাক্ষী" ইত্যাদি শ্লোকটীর আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেকগুলি পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত পরমপূজ্য পণ্ডিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইঁহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি এই পড়িবার ঘরে থাকিতাম, পড়ি না পড়ি, একখানি পুস্তক হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সময়-সময় ঢুলিতাম, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক জন প্রতিভাবান্ ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয়, স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়ামণি-মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট "নলোপাখ্যান" ও "শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান" আমি প্রথম শুনি। আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি-মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক দুইটা ভাষা এক সঙ্গে শিখিতে পারিবে না, এই উত্তরে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম,—"বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়, সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।" যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ছন্দোবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেন না। দুর্গেশ-

নন্দিনীর আশমানীর রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত চিরস্থায়ী ছিল কি না, জানি না, কেন না, তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল, সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুরপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে "ইন্দিরা" উপন্যাসটি আবার rewrite করিবেন, এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়দেবের "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" কবিতাটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটী তাঁহার মুখে শুনিতাম; যখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটী যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি "আনন্দ-মঠে" রাখিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী।"

আর একটী গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটীতে মাতিয়া ছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন। মাঘমাসের প্রথমেই এক রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটী গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে

শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম; গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটী শুনিতে পাইলাম—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।" বৈষ্ণব এই গীতটী গাহিতে গাহিতে ঠাকুর-বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন। পর রাত্রে ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া বৈষ্ণব সেই গীতটিই গাহিল! এইরূপ কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি গানটী শুনিলেন। ইহার পর অষ্টপ্রহর এই গীতটী তাঁহার মুখে শুনিতাম।

দোলের পূর্ব্বরাত্রে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে বড় ধূম হইত, নেড়াপোড়া হইত, অনেক বাজি পুড়িত, রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্ত্তন হইত। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতরলোকের ত কথাই ছিল না। মেদনীপুর হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এইদিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্ত্তি,—কখনও অর্জ্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও বা এখানে-ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর-বাড়ীতে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া মন্দির-মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও

ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটী এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি যোল-শ' গোপিনীর ভর্ত্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন?—বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণিমহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।

এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা, সকলেই সে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত! তাঁহারা জানিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়াছিলেন! ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা, সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেই জন্যই কথাটা আমার স্মরণ আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বন্ধু চূড়ামণিমহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা

সেকালের পল্লীগ্রামমাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে। হুগলি কালেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এক জন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ-সন্তান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, "লেখ্ লেখ্ শূয়াররা" বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক এক দিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিন জন

বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত ঢুলাইয়া বলিতেন, "মারি মারি? আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ী তাস খেলতে যাও নাই?" বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয় জন বালকের সহিত কোন কোন দিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেই জন্য দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। স্কুলে, কালেজে, তাঁহার সমাধ্যায়ীদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে এক জন বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গালা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্য্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমত সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাত্তাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটীজুতা পায়ে ফট্ ফট্ শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুন লইয়া নৈহাটীর বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তা ঘাট নির্জ্জন হইল। সকল বাটীর দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ীর দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয়-প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটীর দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্ম্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকা-যোগে আসিত। যে স্থানে সূর্য্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পুর্ব্বে একবার গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার

বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে একদল গোরা আসিতেছে, দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, এক জন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখ্‌তে চায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, এক জন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি কথনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি পিতৃ-দত্ত একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটীতে কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিয়া, উহা জানিতে পারিয়া

ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই ; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলি-ভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া এক জন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, এক দল ডাকাত আমাদের বাটীতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটীতে ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়া-মহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বীগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা ও আমরা চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইব না।" পিসেমহাশয় বলিলেন, "তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক্।" বঙ্কিম বলিলেন, "কেন কেটে যাবে ? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের ভেওর বাগ্‌দি, যাহারা এক একজন লাঠিয়াল ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে, ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।" তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শমতে কার্য্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ী পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলিয়া ডাকিতেন।

আমাদের গ্রামের আড় পারে হুগলি কালেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটীর সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন রে, নৌকা ছাড়্বি ?" মাঝি নৈহাটীর পাটনী, কখন 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌছিত, আর কোন কোন দিন মাঝ গঙ্গায় পৌছিতে না পৌছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণমধ্যেই প্রবলবেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ সকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক দৃশ্য! বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি ষাঁড়গরু দেখিয়া ভয় পাইতেন, তিনি প্রকৃতির এই সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্ত্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে এক জন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। দারোগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোন মতে ধরিতে পারিল না,

কেন না, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British-born subject, সুতরাং হাইকোর্টে সোপরদ্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল; কেন না, তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম-চরিত্রে এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস এরূপ কুয়াসা চারিদিক ব্যাপিয়াছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই; উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা কালেজে যাইবার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক্ ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনর মিনিটে কালেজ-ঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কালেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে?" মাঝি বলিল, "আজ্ঞে, তা জানি না।" "সে কি রে?" "আজ্ঞে, বোধ হয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।" মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা

আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন জায়গা ?" মাঝি বলিল, "বুঝি মূলাযোড়।"

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিংবা যা' তা' গল্প নহে—সে-কালের লোকের নিকট, সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একখানি উপন্যাস কোন কোন ঘটনা অথবা কোন কোন গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসের "ভারতী"তে "বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু" প্রবন্ধে কি ঘটনা অবলম্বনে কপালকুণ্ডলা রচিত হইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে আরও দুইখানির কথা লিখিব। আমাদের খুল্লপিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা, তাঁহাকে আমরা মেজঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত ; উহ প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান-রাজত্বের অবসানকালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেশী গল্প-লেথ-কেরা যেমন নায়ককে মিষ্টার এবং নায়িকাকে মিস্ লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান্ তেমনই তাঁহার নায়ককে মির্জ্জা ও নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন ; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময়

ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমীদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমীদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধ হয় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' বোধ হয় একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল, তাহা লইয়া

স্বামিদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল, যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়। প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিত, আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছু দিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির-অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় এক জন লেখকেও পারিত কি না সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল', 'অজন্মা', এই সকল কথার সর্ব্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত),

তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না, টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এই-রূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাঁকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে "অনন্দমঠ" লিখিলেন।

"বন্দে মাতরম্" গীতটি উহার বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ-বাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র মিত্র "সাহিত্যে" উহার সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বটে, তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি "লোক-রহস্যে" প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। "বন্দে মাতরম্" গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, আজই পাবে।" একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিতমহাশয়ের

উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠ ও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে "বন্দে মাতরম্" গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, —উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন।" সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, "উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।" এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। এক জন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন; পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

কমলাকান্তের "এস এস বঁধু এস !"

রজনী গভীর। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমন সময়ে কোন এক গৃহস্থের বাটীর সদর দরজা হইতে একটী লোক দ্রুতপদে নিস্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূরে আসিয়া বন্দুকের একটি আওয়াজ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুষুপ্ত গ্রামবাসীদিগকে জাগরিত করিয়া চারিদিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। ঐ গৃহস্থের বাটীতেও ঐরূপ ঢাক ঢোল বাজিল। মহাষ্টমী রাত্রিতে সন্ধিপূজা আরব্ধ হইল। সেকালে সকলের বাড়ীতে ঘড়ী থাকিত না। সেই জন্য এই বাটীর গৃহস্থ বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পূজাবাটীর কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে সন্ধিপূজার সময় জ্ঞাপন করাইতেন। রাত্রি তখন কত, তাহা আমার মনে নাই; কেন না, বহুকালের কথা। অনুমান দ্বিতীয় প্রহর হইবে;—অষ্টমীর চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই। এই গৃহস্থের বাটীর ভিতর সর্ব্বত্র আলোকময়। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই আলোকের মালা,—ছোট ছোট প্রদীপের আলো, সন্ধিপূজার আলো। গুটিকতক বালক ঐ আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল যেটি নিভিতেছিল, তৎক্ষণাৎ সেইটি জ্বালিয়া দিতেছিল। পূজার দালানেও ঐরূপ আলো, দশভূজার সম্মুখ হইতে উঠানে নামিবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত

ঐরূপ দীপের শ্রেণী। অল্পক্ষণ পরেই ঢাক ঢোল বাজনা বন্ধ হইল, কেবলমাত্র দশভুজার সম্মুখে পুরোহিত ও তন্ত্রধারের মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভিতর-দালানের মধ্যস্থলে সিংহ-পৃষ্ঠে অসুর-মর্দ্দিনী বাটী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তন্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশী, তাহার নিকটে পুরোহিত ও তন্ত্রধার বসিয়া পূজা করিতে-ছিলেন। তাঁহাদিগের সন্নিকটে একটী থামে ঠেস দিয়া পৃথক আসনে এক ব্যক্তি বসিয়া,—ইনি দেখিতে সাধারণ মনুষ্যের মত নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা, কোনও মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কাম-ধর্ম্মাবলী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী ইঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্রত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।" এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম তখন প্রায় অশীতিবৎসর অতীত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, দেহ না ক্ষীণ না স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন। বাড়ীর দালানে কতকগুলি প্রাচীন ভদ্রলোক মাথায় চাদর জড়াইয়া একখানি গালিচায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রতিমার পশ্চিম দিকে, অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে কতিপয় সধবা, বিধবা, প্রাচীনা গলায় অঞ্চল দিয়া বসিয়া জপ করিতেছিলেন।

আমি একটী থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কি দেখিতে-ছিলাম ঠিক মনে নাই। ছেলেগুলি আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাছে তাহারা আলোতে কাপড় ধরাইয়া ফেলে, বোধ হয়, তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে আমার পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া টানিলেন, অর্থাৎ সরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, গোঁফের চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, মস্তকের অনেকগুলি কেশ পাকিয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনের পূর্ণযৌবন বঙ্গসাহিত্য ; সমাজে তাঁহার একাধিপত্য। তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই।

আমি তাঁহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া অসুরের মাথায় কৃষ্ণবর্ণের একটি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা যে কি, দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারি নাই ; পরে জানিয়াছিলাম, উহা বিল্বপত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসুরের মাথায় ওটা কি ?" কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, "উহা গণেশের ইঁদুর।" আমি বলিলাম, "গণেশের ইঁদুর অসুরের মাথায় কেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "ক্ষুদ্র জানোয়ারদের অসুরের ঘাড়ে উঠিবার ঠিক এই সময় হইয়াছে, —দেখ, ঐ কার্ত্তিকের ময়ূর অসুরকে ঠোকরাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতেছে,—আর ঐ দেখ, প্রতিমার চারিধারে সোলার পাখীগুলা আছে, উহারা ডানা ঝাড়িতেছে, উহারা উড়িয়া আসিয়া অসুরের

ঘাড়ে বসিয়া ঠোকরাইবে” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “অসুরের অপরাধ ?” তিনি বলিলেন, “অপরাধ কিছুই নহে,—যাহারা প্রবল-প্রতাপান্বিত, অপরাজেয়, যাহাদের সকলে ভয় করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থাতে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহাদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করে।” আমি বলিলাম, “অসুরের ত এখন মুমূর্ষু অবস্থা নহে, ঐ দেখুন, ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেবীকে তরওয়াল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “বটে বটে! বীর পুরুষেরা, তেজস্বী পুরুষেরা শত্রু-হস্তে ঐরূপেই মরে, ম’রেও মরে না, কিন্তু অসুরের আর কি আছে, অসুর ত মরেছে, সিংহ ভীষণ দন্ত দ্বারা উহাকে কামড়াইতেছে, আর দেবী একটা ভয়ানক সাপ উহার গায়ে ছাড়িয়াছেন, সে মুহুর্মুহুঃ উহাকে ছোবলাইতেছে, আর তিনি স্বয়ং দক্ষিণের এক হস্তে বর্শা দ্বারা সজোরে উহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছেন, আর বাকী অষ্ট হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে নানা অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন,—অসুর মরেছে, ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঘাড়ে চড়িবার এই ত সময়।” কথাগুলি আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহা আমি আমার নিজের ভাষায় সাজাইয়া বলিলাম।

এই কথোপকথনের পর বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিলাম। সেখানে কেহ তামাক খাইতেছিলেন, কেহ বা খোস গল্প করিতেছিলেন, প্রায় সকলেই বঙ্কিমের প্রতিবাসী। কেহ কেহ প্রথম রাত্রের ফলাহারের পর আর বাটী যান নাই, ঐ ঘরেই ছিলেন। আর কেহ কেহ বাদ্যোদ্যম শুনিয়া আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন বিদেশীয়,—

ঐ গ্রামের কোনও এক ব্যক্তি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আফিসে চাকুরী করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান চাকুরী কলিকাতার বড়মানুষদিগের মোসাহেবী। যখন পরিবার পিত্রালয়ে থাকিতেন, তখন ইনি প্রতি শনিবারে ও অন্যান্য ছুটীতে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন। এই বাবুটির কথা এই স্থানে উল্লেখের কারণ পরে প্রকাশ পাইবে। আর একটী বিদেশী লোক অতি কুণ্ঠিতভাবে বসিয়াছিল। ইহার নাম বলহরি দাস, রাণীহাটী পরগণায় ইহার বাটী, যে স্থানের কীর্ত্তন "রেনিটী"র কীর্ত্তন বলিয়া বিখ্যাত। এই লোকটী ভাল কীর্ত্তন গাহিতে শিখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজের নিকটেই থাকিত। অদ্য তাঁহারই আদেশানুসারে উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পরে সকল ভ্রাতা উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও আসিলেন। বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কোনও মজলিসে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলের গায়ে যেন electricity ছড়াইয়া দেয়, সকলেই উল্লসিত হয়। আমি দেখিয়াছি, এই গুণটী যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তাহা নহে। দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রেরও ছিল; মধুসূদনের কিয়ৎপরিমাণে ছিল বটে, কিন্তু সে অন্যরূপ। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মজলিস সরগরম হইল, যাঁহারা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন, হাসির হর্‌রা উঠিল, তামাকের ধোঁয়াতে ঘরের আলো মিটমিট করিতে লাগিল। অনেকে শুনিয়া চমকিত হইবেন, কেহ কেহ বা বিরক্ত হইবেন, আমরা চার ভ্রাতা একত্র বসিয়া তামাক খাইতাম

—অতিরিক্ত তামাক খাইতাম, এমন কি, মুখ হইতে নল নামিত না। শুনিলে আরও হাসিবেন, আমি এ প্রাচীন বয়সে ধূমপান করিয়া জীবিত আছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরে ঐ মোসাহেব বাবুটী তাঁহাকে আত্মীয়তার ভাবে অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লোকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছিল, তাহাই শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ এই যে, তিনি তাঁহার বঙ্গদর্শনে "উত্তর-চরিতে"র সমালোচনা করিতে গিয়া পুরাতন লেখকদলের চাঁইকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।*

পুরাতন দলের লেখকগণ ও তাঁহাদের ভক্তেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যেরূপ গালিগালাজ করিয়াছিল, মোসাহেববাবু তাহা শুনিয়া আসিয়া সে কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু গালি শুনিয়া কোনও উত্তর দিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল —দুই ভ্রূ এক হইল। আর সজোরে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। খুব বেশী পরিমাণে ধূম উদ্গিরণ হইতে লাগিল।

এই "উত্তর-চরিতে"র—সমালোচনা সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গদর্শনের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক একদিন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরাতন দলের চাঁইকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে কেন?"

---

* বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে বিদ্রূপ-কথাগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "পুরাতন মন্দিরগুলিকে নাড়াচাড়া করা উচিত নয় কি ?" লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঐ মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, উহার স্থানে নূতন মন্দির উঠিবে।"

তাহাতে লেখক কি বলিলেন, তাহা ঠিক মনে নাই। তবে উহার মর্ম্ম এই যে, "উহা বড় কঠিন।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন, "দেখা যাউক।" বঙ্কিমচন্দ্র এক "উত্তর-চরিতে"র সমালোচনায় পুরাতন দলের প্রধানকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, এই দুই কারণে পুরাতন দলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে হইতেই উঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিরোধী ছিলেন। যখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন হইতেই তাঁহারা বিরোধী। "সোমপ্রকাশ" কাগজে দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা বঙ্কিমের ব্যাকরণ-দোষ, ভাষা, উপন্যাসখানি ইংরাজী গল্পের অনুকরণ, এই কয় দোষ ধরিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণশিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল। ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তবে কেন যে লিখিতে বসিলে সকল সময়ে ব্যাকরণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাহা বোধ হয় আধুনিক লেখকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সুহৃদ দীনবন্ধু সোম-প্রকাশের সমালোচনার উত্তর দিয়া কিছু দিনের জন্য

পুরাতন লেখকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইত, আর তাঁহারা ঝাঁকিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লেখা বন্ধ হয়। কেন না, উহা অসাধু ভাষায় লিখিত, এবং বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ, উহা পাঠ করিলে লোকের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা দুর্দ্দমনীয় বেগে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। ঐ ভাষার নামকরণ হইল বঙ্কিমী ভাষা, এবং তাঁহার পুস্তকের "দূষিত বিদেশীয় ভাব" জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিল।

যাহা হউক, এবারে মহাঅষ্টমীর সেই রাত্রের কথা বলি। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। আলস্য বোধ হওয়াতে আমি একটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিলাম, ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অতিদূরনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার যে কি সুখানুভব হইল, তাহা যাঁহারা নিশিতে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর পূর্ব্বোল্লিখিত কীর্ত্তন-গায়কটি ঐ ঘরে একটী গীত গায়িতেছিল। যেমন মধুর গীত, তেমনই মধুর সুর। আমি স্থিরভাবে রহিলাম, পাছে নড়িলে এ মোহ ঘুচিয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া গায়ক গীতটি গায়িল। গীতটি এই—

"এসো এসো এসো বঁধু, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমাধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলেপরি,
ফুল নও যে কেসের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুই'লে কেশ নাহি বাঁধি
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥"

অনেকক্ষণ পরে গীত বন্ধ হইল। গায়ক বাহিরে উঠিয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া বসিলাম, এদিক্ ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, মুখ হইতে নল অনেক্ষণ খসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি কোথায়?—একখানি ছবির প্রতি। ছবিখানি বিলাতী ছবি, একটি অনুপমা সুন্দরী, এক-ছড়া মতির মালা গলায়; আর একছড়া মতির মালা একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে অতি সঙ্কুচিতভাবে তুলিতেছেন, আর হাসি-হাসি-মুখে বামদিকে অপাঙ্গে কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, যেন তাহার অমতে উহা তুলিতেছেন।

অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দরীর একছড়া মতির মালায় মন উঠে নাই, আবার একছড়া তুলিতেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সেই ব্যক্তি ঐ পটে অঙ্কিত নাই। ছবিখানি বড় সুন্দর, সকলেই উহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি ঐ ছবির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন? তাহা নহে। কে বলিবে তাঁহার মনে তখন কি হইতেছিল? মানবের স্বভাব এই, একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার সময় সাধারণতঃ সে অনন্যমনে একটা পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকে; তাহার দৃষ্টি এক স্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে ঐ ছবিটি ছিল, সেই জন্য দৃষ্টি উহার প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াগিয়াছেন—

"যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈব বংশী লইয়া মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না; সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন পারিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গান শেষ হইলে ছবির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তেমন তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র গীত শেষ হইলে শয়ন করিয়া কড়িবরগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তিনিও প্রতিভাশালী, তাঁহারও মনে কত কি উদয় হইতেছিল, কে জানে? গায়ক পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। আবার গান আরম্ভ হইল।

এবার অন্য গান হইল, "এস তোমায় নয়নে লুকাইয়া থোবো" ইত্যাদি। ভাবিলাম, ইহা অন্য কবির রচিত। এমন সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "এ অন্য কারিগরের হাতের।" তার পরে অনেক বৈষ্ণব কবির, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতির রচিত গীত চলিল। অবশেষে "এস এস এস বঁধু এস" গাইবার ফরমাস্ হইল। আবার সেই সুরের তরঙ্গ উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সকলে নিঃস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল—গান শেষ হইল। ইতিমধ্যে কে এক জন আমার নিকটের জানালা খুলিয়া দিল, জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভোর হইয়াছে, কিন্তু তখনও একটু অন্ধকার আছে, নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতি হইয়াছে, কেবল পূর্ব্বদিকে একটা তারা বড় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। উহা বুঝি শুকতারা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠ ছিল; তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে আম্রকানন ছিল, উহার গাছগুলির উপরে অসংখ্য পাখী কলরব করিতেছে। ক্রমে ফরসা হইল, পাখী-গুলি আহারান্বেষণে দিগ্-দিগন্তে উড়িয়া গেল, আর বৈঠকখানার বাবুরা আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। এইরূপে মহাষ্টমীর রাত্রিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র "এস এস বঁধু এস" গানটী প্রথম শুনিলেন। ইহার বহুদিন পরে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীকে "বঙ্গ-দর্শনে" এই গান শুনাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের বন্ধুত্বের কথা বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত-সমাজে বিখ্যাত। ইঁহারা যখন উভয়েই বালক, তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া "প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চোদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখোচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের Royal loversদের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল। সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত। "প্রভাকরে" দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন। সংবাদপত্রে উহাকে কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল।

আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে,—একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে—পত্রে কি লিখিয়াছে? তিনি কোনও উত্তর না দিয়া

আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি দেখি' বলিয়া উহা তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম—আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন, তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এই স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, পরক্ষণেই নরমস্বরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে ? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম, "আপনিও গালি দিয়া লিখুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "লিখিব বই কি।"

আমি তখন দীনবন্ধুর নাম শুনিয়াছিলাম। "প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" সংবাদপত্রে কবিতার নীচে দীনবন্ধুর নামও দেখিতাম।

দীনবন্ধুর বাল্যকালের পত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্সের ভিতর থাকিত। সেগুলি কি হইল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ পত্রগুলি যে এক্ষণে সাহিত্য-সমাজের বিশেষ আদরের হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোনও এক বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে স্থলের এক যোড়া জুতা, যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাহার সহিত একখানি তিন-কথার পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা—"বঙ্কিম, কেমন জুতো !" পত্র-

খানি আমি পড়িয়াছি; অনেকেই পড়িয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন, তাহা তখন আমরা জানিতে পারি নাই। পরে সঞ্জীব বাবুর নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমার মুখের মতন।"

হাস্যরসে ও বাক্‌পটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন। কেবল এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পরাভূত করিতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবান্, ব্রাহ্মণ, কুলীনের সন্তান, স্বাধীন, অর্থাৎ জমীজমা চাষবাস ইত্যাদিতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। ইনি ভাঁড়ামীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ওরফে গুরোতুম্বো মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু এই ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইঁহার নাম—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে, গান শুনিয়া গায়িতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কোনও ওস্তাদের নিকট শিক্ষা পান নাই। ইনি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকিতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাটীতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় নহেন) উপস্থিত হইলেন। শিষ্য-গৃহে গমন উপলক্ষে ইঁহার সর্ব্বদা কৃষ্ণনগরে যাতায়াত ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির কথা কহিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দসহকারে উহা শুনিতেছিলেন,

কিন্তু উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একযোড়া ঘুঙ্ঘুর পায়ে দিয়া একটী গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। (ঘুঙ্ঘুর যোড়াটি ঐ ঘরে সংগ্রহ করা থাকিত)।—গীতটি এই—

"কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।"

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধুও খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে, দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও তাঁহার পত্নী গোলাপ ফুল—বাবলা গাছে গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্নীসহোদরবাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। এই বৎসর শ্যামাপূজার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দুই অগ্রজ ভ্রাতা যখন কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান, তখন বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়কে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ইঁহাকে ভাই-ফোঁটার দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আহারের সময় বড় গোল বাধিল। ছাই পাঁশ, গরুর চোনা ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়কে থাওয়াইবার জন্য দীনবন্ধু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সাধ্বী পতিপরায়ণা, যিনি ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন, তিনি অদ্যাপি জীবিতা।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাহাল হইয়া যান,

দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোষ্ট-অফিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলনে বঙ্গসাহিত্যের কি শুভ ফল ফলিল, তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। এই মিলনের পর হইতে দুই জনে প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন। এক জন বঙ্গের প্রধান নাটককার হইলেন, দ্বিতীয় প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি "নীলদর্পণ'' রচনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি "দুর্গেশনন্দিনী'' প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" যে সাহিত্য-সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, এক জন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন, এবং অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রীমকোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, দীনবন্ধুর প্রথম নাটকখানি সর্ব্বাংশে শক্তিশালী, এবং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত এবং সুদূর বোম্বাই সহরে পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য-জগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। "দুর্গেশনন্দিনী"র আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ একটি সামান্য ঘটনা এ স্থলে প্রকটিত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। কিন্তু "দুর্গেশনন্দিনী'' প্রকাশিত হইবার

পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার নিজের লেখনী-শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সে জন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিতেন, ভাটপাড়ার খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কেবলমাত্র এক জন জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন। এক সময়ে, বড়দিনের কি মহরমের ছুটীতে আমার ঠিক মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত "দুর্গেশনন্দিনী" তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন; কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুই বছরের শিশু ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়্‌খড়ির পাখি টানিতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন; মুহুর্ম্মুহুঃ তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত; তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিতমহাশয়েরা নস্যের ডিবা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কি না, সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেন না, আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। এক জন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "আ মরি, আ মরি! কি

বক্তৃতাই করিতেছেন !" এইরূপে দুই দিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, "দুর্গেশনন্দিনী"র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সে জন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (সংস্কৃত কলেজের ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন, "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ-দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" ভাটপাড়ার পণ্ডিতমহাশয়দিগের মতামত এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা কলিকাতার পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা কোনও শাস্ত্রে খাট ছিলেন না। কিন্তু কলিকাতার যে সকল পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের নবীন ভাষার অবতারণা করিবার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

"দুর্গেশনন্দিনী" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সে কালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি "দুর্গেশনন্দিনী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে

কি না সন্দেহ।" ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্‌বাক্য সফল হইয়াছিল; যতদিন না "দেবীচৌধুরাণী" প্রকাশিত হইয়াছিল, ততদিন "দুর্গেশনন্দিনী"রই বিক্রয় বেশী ছিল।

নবপ্রকাশিত "সংকল্প" মাসিকপত্রে কোনও প্রসিদ্ধ লেখক "বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দুর্গেশনন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তাঁহার অনুজ ৺তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা), যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বি-জয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি দশ বারো জন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন; তিনি তাঁহার ইংরাজি-শিক্ষিত বন্ধুদিগের যেরূপ আদর সম্মান করিতেন, ইঁহাদেরও সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ও ইংরাজি সাহিত্যে বুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্কিমচন্দ্রের

সহিত শাস্ত্রবিচারে ছুটিয়া যাইতেন। ভাটপাড়ার এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবরাম সার্ব্বভৌম অষ্টাদশবৎসর বয়ঃক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী যুবাবয়সে শ্লোক রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। একে, বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তার পর দেখিতে সুপুরুষ, একুশ বছরের যুবা, আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশঃও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটী লইয়া বাটী আসিলেন; সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; পরে একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। ইনি গত ১০ই ভাদ্র বুধবার সায়ংকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে এক জন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা

দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তথন জেলা ছিল না) বদলী হন। ঐ সময়ে তিন চারি দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন; যথা,—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হয়, কথনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায়, এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটীকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যথন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তথন সেই স্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি থাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল থাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে, দরিদ্রঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরী করিয়া থাইবে, অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের

লোক হইয়া পড়িবে ; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন,হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোগত হইল না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি-রূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

"বঙ্গদর্শনে" "বিদায়" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।" লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যশোহরে ইঁহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইঁহারা প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন ; উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন। ফলতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক, "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিষবৃক্ষ"-প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি সেই সময়ে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সে জন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতী"তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্বহিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু হাস্যরসে

দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিলিয়াছিল কি না, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোনও কোনও পুস্তকে শিক্ষানবীশীরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে, কিন্তু সে লেখা যে, কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোনও গৃহস্থের বাটীতে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির এক বিখ্যাত কারিকর, নাম কালাচাঁদ পাল, দুর্গোৎসবে দশভুজার প্রতিমা গড়িত। ষষ্ঠীর দিন রাত্রিকালে বিদেশ হইতে বাটীর কর্ত্তা আসিয়া প্রতিমা-দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দালানে একটী লোক দাঁড়াইয়াছিল; সে করোযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে, এ প্রতিমা আমি গড়িয়াছি!" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সে লোকটী বলিল, "আমি কালাচাঁদের ভাইপো।" কর্ত্তা কহিলেন, "না, তা কখনই হইতে পারে না, এ প্রতিমা কালাচাঁদ গড়িয়াছে।" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "আমি উহাতে খড় জড়াইয়া এক-মেটেমো করিয়াছি, আমার খুড়োমশাই দোমেটোমো করিয়াছেন, মুখ গড়িয়া বসাইয়াছেন।" তখন কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া তাহাকে একটি টাকা বখশিশ দিলেন। আমি সেইরূপ দুই একটি পরিচ্ছেদে এক-মেটানো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দোমে-টোমে করিয়াছিলেন। কোন পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম; পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি

উপযাচক হইয়াই লিখিতাম, কখনও কখনও তিনি ইচ্ছা করিয়াও আমাকে লিখিতে বলিতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লিখিতে নিজের কথা কেন! একটা বিষয়ের কৈফিয়ৎ দিবার জন্যই নিজের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

"ভারতী"র "বঙ্কিম-যুগ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত কথা-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণকান্তের উইলের কোনও কোনও পরিচ্ছেদে, আর উহার উইল-চুরী পরিচ্ছেদে আমার একটু আধটু লেখা আছে। এখন বুঝিতেছি, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, পরিচ্ছেদটী সমুদয় আমার লেখা। তজ্জন্য ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যার "ভারতী"তে "বঙ্কিম-যুগ" প্রবন্ধে তিনি ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে, রোহিণী ও কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি তাঁহাকে কখনও এমন কথা বলি নাই যে, ঐ অংশটুকু আমার লেখা। আমি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। তাঁহার সহিত ঐ আমার প্রথম আলাপ। "উইল-চুরী" পরিচ্ছেদে আমার কতটুকু লেখা আছে, তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল-চুরী পরিচ্ছেদে লিখিতেছিলেন, এমত সময়ে পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন। তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম,"কি লিখিতেছিলেন—বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।" তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে

লিখিতে অনুমতি দিয়া, ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম, "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলীল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।— এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এই স্থানে রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম, এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণ-কান্তের আফিমের ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে "দোমেটোমো" করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে "মাটী" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ literary activity জন্মিয়াছিল, কিন্তু "বঙ্গদর্শনে"র বিদায়ের সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিসের কি সাহেবসুভার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই সাহেবের কথা ও আফিসের কাজ কর্ম্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না। একরাত্রিতে কোনও ডেপুটীর বাড়ীতে একটা বড় ভোজ ছিল;

ডেপুটীতে ডেপুটীতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। এক জন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ইহার কিছু পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এই সভাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন :—

"ধন্য এক জনা হয়েছে,

পেখের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।"

এই ডেপুটী বাবু বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি তাহাকে এরূপ ভৎ‍র্সনা করিলেন। এক জন ডেপুটী কোনও বিশেষ সরকারী কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ কার্য্য তিন বৎসরে শেষ হইবে, কেন না, ঐ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য জেলায় জেলায় ঘুরিয়া অনেক বিষয়ের তদন্ত করিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটী বাবুটী ঐ কার্য্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন। ডেপুটী বাবু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কি প্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন "ওহে—, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলে!"

ডেপুটী বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন; তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁষিতেন না। কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহারা আনুগত্য করিতেন।

দীনবন্ধু কলিকাতায় সদর আফিসে আসিলে পোষ্টাল

ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র সন্তানকে তিনি চাকুরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন, তাহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরাণীগিরি, কাহাকেও সব পোষ্টমাষ্টারী, যে যাহার যোগ্য, তাহাকে তাহাই দিতেন। সে জন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন!

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলাম-চোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময়ে এক জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।" তিনি আমাদের পরিচিত, কিন্তু স্বগ্রামবাসী নহেন, পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে তাঁহার বাস। দীনবন্ধু তখন খেলিতে বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "একটু বসুন, পরে শুনিব।"

গোলাম-চোর খেলা, পল্লীগ্রামে কি নগরে, গৃহস্থের বাটীতে কি ধনাঢ্যের বাটীতে, সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি প্রকারে সেই সামান্য খেলাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা যদি এ স্থলে উল্লেখ করি, তাহা হইলে, আশা করি, পাঠকমহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। আমাদের গ্রামস্থ সাত আট জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েক জন লোক খেলা আরম্ভ করিলেন; তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাহাকে দীনবন্ধু ভাই-ফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন; কারণ, ইনি সকলকেই গালি দিতেন, কাহাকেও ছাড়িতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ ও আমরা অনেকে দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের

দলভুক্ত হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিঃসহায় ছিলেন, এমন নহে; তাঁহারও দলে অনেক লোক ছিল। তন্মধ্যে একটী লোকের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ীতে আসিলে কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা এই পরিচয়ে কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই লোকটি ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন, কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন; আবার সেই সঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে, চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন—সর্ব্বদা লিখিবার জন্য 'subject' খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন, "আপনি চূত ফল সম্বন্ধে লিখুন, বেশ ভাল 'subject'।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চূত ফল কাহাকে বলে?" সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন, "আম।"

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন। প্রবন্ধটীর প্রথমাংশ আমার মনে আছে, উহা নিম্নে প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি পাঠকমহাশয়েরা রাগ না করেন।—

"আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার অতি টক, বাগাতেঁতুলের মত টক, আঁব আঁশাল, কোন কোন আঁব আঁশাল হয় না, কারণ ভাল গাছের আম আঁশাল হয় না, ইত্যাদি।" এই প্রবন্ধটির পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু গম্ভীরভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন; সকলেই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু এক ব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন;

পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তবে আমার প্রবন্ধটী ছাপাইয়া দিন।" বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই সেটা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম, সেই জন্য উহার প্রথমাংশ আমার স্মরণ আছে। * * * খেলা আরম্ভ হইলে দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকেই, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন, যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যার চোর হয়; কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ!" দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই এক জন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙ্গুর যোড়াটী পায়ে দিয়া রূপচাঁদ পক্ষীর একটী গীত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইল। দীনবন্ধু তখন পূর্ব্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অনেকগুলি বিধবা, নাবালক, নাবালিকা প্রতিপালন করিতে হয়, দিন চলে না, তাহার একমাত্র পুত্র যদি একটা চাকুরী পায়, তাহা হইলে অনেকগুলি ব্যক্তির জীবনরক্ষা হয়। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার আফিসে যাইতে বলিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম, ব্রাহ্মণ-পুত্রের পোষ্টআফিসে চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে, কিন্তু খালি কবে হইবে, তার ঠিক নাই। এক মাস হইতে পারে, ছয় মাসও হইতে পারে। ইতিমধ্যে হুগলীর একটী ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা

করিতে আসিলেন। তাঁহার অধীনে রোডসেস্ ডিপার্টমেণ্টে একটী চাকুরী খালি ছিল। ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরী দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু উহাকে সবপোষ্টমাষ্টারী পদে বাহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্ত, এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়স্বরূপ উহা এ স্থলে উল্লেখ করিলাম।

আমি উপরে বলিয়া গিয়াছি যে, নানা প্রকৃতির লোক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এখানে আর একটী লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইঁহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে মাদ্রালগ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। ইনি এক জন উপস্থিত কবি ছিলেন। এই কবি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন, সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি কখনও আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা!" অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন—

"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি উদ্ভট প্রশ্ন? যাহা কখনও পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে? আকাশে কখনও কি শেয়াল উঠেছে যে, গগনেতে হুয়া হুয়া করে' ডাক্‌বে?"

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভৎ র্সনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটী কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ কবিতার প্রথম দুই চারি পংক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঘাট হইয়াছে, আপনি অপরাজেয়।" পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম্ম এই, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে ধন্বন্তরিপুত্র সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত উপাড়িয়া লইয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে সূর্য্যদেবকে বগলে পুরিয়া লইয়া পাহাড় মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন; ঐ পাহাড়ে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি পশু-গণ বাস করিত; তন্মধ্যে শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল। দারুণ গ্রীষ্মযন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহ-ছাদে শয়ন করিয়াছিল; আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল,—

"কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে,
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল। তাহার প্রথম পরিচয়

নীলদর্পণ-প্রচারে পাওয়া যায়। এ ত গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্ব্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর উহা কষ্টকর বোধ হইত। এক জন মাতাল ট'লে ট'লে খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, হাসিতেছে; কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল, সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্র-লালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ফাডার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের ড্রেণে একটী ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল, একটা গরু ড্রেণে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, উহা গরু নয়, একটা বাবু মাতাল ড্রেণে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিন জনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটী নবীন যুবা, পরিপাটী বেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আমাদের তিন জনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতাল বাবু বলিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুঁড়ীর দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে যাইতে খানায় পড়িয়া

গিয়াছেন। শ্বশুরের নামধামেরও পরিচয় দিলেন। তাঁহার শ্বশুর সেখানকার এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, আমরা সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু ঐ বাবুর শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন, "আপনি অমুকের জামাই!" এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন—"You know my father-in-law sir,then you are my father-in-law, sir, yes sir, son-in-law sir, I sir, son-in-law sir!"—এই বুলি ধরিলেন। যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার মুখে কেবল ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ কথাতে "Yes sir, son-in-law sir" এই ধুয়া বরাবরই ছিল। পৃথিবীর উপরিস্থ পদার্থের প্রতি মাধ্যাকর্ষণশক্তি যেমন স্যার আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা তেমনই মাতালের প্রতি খানাডোবার আকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেন না, মাতালবাবু যে দিকে খানা, কেবল সেই দিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্বদিকে সমতল ভূমি, সে দিকে কোনও মতে টলিবেন না; ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ড্রেণের দিকে দাঁড়াইলাম, এবং তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিছু দূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেণের দিকে আছি, কোনমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।" তিনি বলিলেন, "না হে না"। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। আমার তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিম দিকে বৈদিক-

পাড়ার একটি গলি হইতে দুই জন বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দসহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু এক জনের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কি, ইনি কে!" তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বুক চাপড়াইয়া "Son-in-law sir, yes sir, son-in-law sir!" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাঁহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিকঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টীকি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটীজুতার ফটফট্ শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম —বৈদিক ঠাকুরেরা 'দাতাল মাতাল'কে বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় দশ পনের মিনিটে আমরা বাটী পৌঁছিলাম। পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি গম্ভীরভাবে ছিলেন; এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। ঘামিতেছেন, হাঁপাইতেছেন, আবার হাসাইতেছেন, এবং হাসিতেছেন। এখানে বলা বাহুল্য, মাতালবাবুকে খাওয়াইয়া পাল্কী করিয়া শ্বশুরবাটী পাঠান হইল। শ্বশুরবাটী গ্রামান্তরে।

অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি, যাহার পেশা মাতাল হইয়া খানায় পড়া, তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকে? সে কেবল দীনবন্ধু। অন্ত কোনও ভদ্রলোক হইলে উহাকে খানা হইতে তুলিয়া নিকটস্থ কোনও দোকানে (ঐ স্থানে অনেক দোকান ছিল)

রাখিয়া বাটী চলিয়া যাইতেন; আরার কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেন; কিন্তু দীনবন্ধু অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটী বিশেষ রোগ ছিল; বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোনও নাটকে সে চরিত্রটী অঙ্কিত করিতেন। এই মাতাল বাবুই "সধবার একাদশী"র "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইহারা দুই জনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন, এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু "বঙ্গদর্শন"-প্রকাশের অল্পকালমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজের চারি দিক হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু "বঙ্গদর্শন" মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে "বঙ্গদর্শনে"র যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন "বঙ্গদর্শন" বিদায়গ্রহণ করিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায়-প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইবে :—

"আর এক জন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্যপটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিম-চন্দ্রের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে, তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় আট নয় বৎসর পরে "আনন্দ-মঠে"র উৎসর্গ-পত্রে "কুমারসম্ভব" হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "হে ক্ষণভিন্নসৌহৃদ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে!" বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, দীনবন্ধু "আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু"—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মশিক্ষা

শ্রাবণ মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃপ্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—যখন আমরা উভয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর, ৺ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইলাম (আমি তখন রঙ্গপুরে এক জন ডিপুটি ছিলাম), ঐ সময় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ উঠিত ও আমার পিতৃদেবের কথা আমার মুখে শুনিতেন (ইহার প্রায় আট মাস পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাহা অবলম্বনে আমাদের পিতৃপ্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর একদিন বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজের অগ্রণী হইবেন; তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা আসিয়াছিল যে, তিনি এক জন আসাধারণ বুদ্ধিমান্, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ একটা কথা লইয়া 'নারায়ণ'-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। সে কথাটি এই—"পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বজীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পরে তাহা সংশোধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রোতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ, * * শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।"

এই কথা কত দূর অসঙ্গত, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা-সভায় দিন দুই যাইয়া বঙ্কিমবাবু আর যাইলেন না, তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। তিনি গত বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বঙ্কিম-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিমবাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছি-

লাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।”

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিমবাবুর উপকার হইয়াছিল, এবং পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল ?

আসল কথা এই যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি “নবজীবনে” ও “প্রচারে” হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিববাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ-সভা বসে; তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল; বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন, এমত নহে, তিনি সভা-

পতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তার পর দুই একদিনমাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।

ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্ম্মের উদ্দীপন হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারী সাজাইলেন, আলমারী ভরিয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র না ছিল! এমন কি, জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল;

তথাপি রবিবারে রবিবারে কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনও ধর্ম্ম-প্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া গিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই; এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্ব,কৃষ্ণ-চরিত্র, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন,এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি University Instituteএ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষা পান নাই। তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্রত করিয়াছিলেন—" ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকা কালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা যে হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কলমের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না।

১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে "Statesman" সংবাদপত্রে হিন্দু-ধর্ম্ম লইয়া Rev. Dr. Hastie সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে বঙ্গদর্শনে "দেবীচৌধুরাণী" বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে "নবজীবনে"র প্রথম সংখ্যায় "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ সনের শ্রাবণের "প্রচারে" প্রথম সংখ্যায় "সীতারাম" বাহির হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এখন পাঠক মহাশয়েরা বলুন দেখি, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি ?

বঙ্কিম সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ আর একটি কথা লিখিয়াছেন, তাহাও অমূলক। যথা :—"সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, শেষ জীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি যত দুর জানি, বঙ্কিমচন্দ্র জাপক ছিলেন বটে, কিন্তু জপের মালা ঘুরাইয়া জপ করিতেন না। আমাদের পিতৃদেবও জাপক ছিলেন, তিনিও কখনও জপের মালা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় চারি বৎসর আমি আলিপুরে বদলী হইয়া তাঁহার নিকটেই ছিলাম, কই, কখনও ত জপের মালা ঘুরাইতে তাঁহাকে দেখি নাই।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর আমাদের পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন যে, উহা আমি

চিরকাল স্মরণ রাখিব। তিনি লিখিয়াছেন,—ঐ ঘটনাটি আমার মুখে শুনিয়াছেন। সে আজ অনেকদিনের কথা, প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। ১৮৮১ সালে আমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়। এই দীর্ঘকালে যে আমার পিতৃদেবের কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিজের ভিন্ন পরের কথা ভালরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব নহে, এজন্য এ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি ভুল হইয়াছে। আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; কেন না, ঐগুলি আলৌকিক ঘটনায় জড়িত। তবে এইরূপ ঘটনাতে বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল যে, পিতৃদেব বাল্যকাল হইতে দেবভক্ত ছিলেন, এবং দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বোধ হয়, এই ভক্তির জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধে দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। ঐ মহাপুরুষের দ্বারা পিতৃদেবের দীক্ষা হওয়াতে, এই গল্পটি আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং আমিও পণ্ডিতরাজকে ও ডাক্তার কে, ডি, ঘোষকে বলিয়া থাকিব। প্রায় চারি বৎসর হইল, দীনবন্ধুবাবুর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র এই ঘটনাটি "মানসী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার শুনা কথা। আমিও যাহা নিম্নে লিখিব, তাহাও আমার শুনা কথা।

আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমকপোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওটি একটি লোভনীয় পদ ছিল; কেন না ঐ পদের মর্য্যাদাও খুব ছিল,এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন, এবং সে দেশের লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; অদ্যাপি উহা কাশীনাথ-মন্দির বলিয়া খ্যাত। আমাদের দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত, তিনি সকলকেই এক একটি চাকুরীও দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার পিস্তুতো ভাই ৺ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক জন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারই নিকট নিম্ন-লিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।—

পনর ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রধান পূজারীর নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। যাজ-পুরে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পিতামহ পরদিন প্রত্যুষে উহা জানিতে পারিয়া দুইটী বিশ্বাসী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন; কিন্তু পথে তাঁহার সহিত তাহাদের দেখা হইল না। পিতৃদেব পদব্রজে কয়দিনে যাজপুরে পৌছিলেন, সেইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। রাস্তায় তাঁহার কাপড় চাদর ও টাকাকড়ি চুরী গিয়াছিল কি না, শুনি নাই। যাজপুরে কিছুদিন থাকিয়া পার্সী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয় ঐ ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃদেবকে

ঐ ভাষা শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জ্যাঠামহাশয় অনুজকে একটিন্ দিয়া পিস্তুতো ভাই ও দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া মাস কয়েকের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন। এক জন প্রধান কর্ম্মচারী কাজ চালাইত; পিতাঠাকুর কেবল দস্তখত করিতেন। কিছুদিনের পর তাঁহার জ্বর হইল। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেস্থানের লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল; অবশেষে নাড়ীত্যাগ হইল এবং তাঁহাকে বৈতরণী-তীরস্থ করিতে হইল। প্রাণত্যাগ হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে একখানি চাদরে ঢাকিয়া আত্মীয়েরা সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভিড় ঠেলিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজূটধারী, পরিধানে গেরুয়া বসন, পদ-যুগলে খড়ম—এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিল। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রক্ষা করুন!" ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হইল না। সকলেই বুঝিল, ইনি দেবপ্রেরিত। এই মহাপুরুষ পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখ হইতে চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন' "কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!"—পরে বলিলেন, "মরে নাই, জীবিত আছে" এবং গরম দুধ

আনিতে অনুমতি করিলেন। এই স্থলে পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত জল ছিটাইতে ছিটাইতে পিতৃদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন'। ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধপান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় পিতার সঙ্গে বাসায় আসিলেন, পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পিতাঠাকুর শয়নাবস্থাতেই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন! মহাপুরুষ বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।" পিতাঠাকুর বলিলেন, "তাহা আমি জানি ; তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

"কি ভিক্ষা ? বল।"

"যদি আমার জীবনদান করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন।"

মহাপুরুষ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে অনেকক্ষণ পিতাঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; পরে স্বীকৃত হইয়া একটি দিনস্থির করিয়া বলিয়া গেলেন যে, ঐ দিনের প্রত্যূষে স্নাত হইয়া থাকিবে, তিনি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন। ঐ দিনের ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "না, ভালরূপ তোমার স্নান করা হয় নাই, এস, আমি বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া আনি।" এই বলিয়া পিতাঠাকুরের হস্তধারণ করিয়া বৈতরণীর জলে তাঁহাকে অনেকবার ডুব দেওয়াইয়া লইয়া আসিলেন। আমাদের ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ

করিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহা সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হইল। বাসার লোকে অনাহারে ছিল। দীক্ষাকার্য্য শেষ হইলে, পিতার গুরুদেব দ্বার খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেই লক্ষ্য করিল, তাঁহার পায়ে খড়ম নাই, খালিপায়ে চলিয়া গেলেন। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তখন দীক্ষাঘরে পিতাঠাকুরকে দেখিতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর কিশোর বালক পীতাম্বর-পরিধানে একটি আসনে বসিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে গামছা বাঁধা একটি পুঁটলী রহিয়াছে। তিনি পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক্রোড়ে কিসের পুঁটলী দেখি।" যেমন কোন শিশুর হাতের পুঁতুল কেহ দেখিতে চাহিলে সে উহা বুকে করিয়া 'না না' বলে, আমার পিতৃদেব সেইরূপ চমকাইয়া "না, না, উহা দেখাইব না" বলিয়া পুঁটলীটি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। পুঁটলীতে কি ছিল পাঠকের বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। উহাতে ছিল—তাঁহার গুরুদেবের পায়ের খড়ম ও উপবীত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অষ্টাশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কখনও কোন দিন তিনি উহা নিজের কাছ-ছাড়া করেন নাই। যদি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোন দিন কোন স্থানে রাত্রি কাটাইবার আবশ্যক হইত, উহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে সত্তর বৎসর উহা বুকে করিয়া রাখিয়া ছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে উহার পূজা করিতেন, এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ ইত্যাদি করিতেন। পরে মৃত্যুশয্যায় উহা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিলেন, "উহাতে আমার গুরুদেবের

খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন।" পিতৃদেব কখনও তাঁহার গুরুদেবের কথা কহিতেন না। আজ পুঁটলী আমাদের দিয়া আদেশ করিলেন, "উহাতে পাথর বাঁধিয়া অতল-স্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।" অতলস্পর্শ অনেক দূর, সেই সাগরসঙ্গমে। ততদূর যাইবার সুবিধা হইল না। হুগলীর নীচে ঘোলঘাট খুব গভীর ছিল, ঐ স্থানে পাথর বাঁধিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইল। পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর আমরা উহা খুলিয়া দেখিলাম,—একযোড়া খড়ম, উহার 'বোল' হাতীর দাঁতের, উহা এত বড় যে কলিযুগে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে ; আর দেখিলাম—উপবীত, সূতার প্রস্তুত নহে, আমার অগ্রজদের বিবেচনায় উহা কোনও গাছের ছাল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, তিব্বত দেশের গাছের ছাল ; উহা তিন-দণ্ডী ; মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি লেখা ছিল ; কি ভাষা বুঝা গেল না ; বঙ্কিমচন্দ্রের বোধ হইল উহা তিব্বতী ভাষা। এই খড়ম ও উপবীত দেখিয়া বুঝা যায় যে, আমাদের পিতৃগুরু এক জন সামান্য মানুষ অথবা বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী ছিলেন না—তিব্বতী পাহাড়ের এক জন তাপস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে একদিন রবিবারে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাটীর সামনের গলিতে দেখা হইল। তাহার পরিধানে মালকোঁচামারা গেরুয়া

ধুতি, গাত্রে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "আপনি কি বঙ্কিমবাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানের কোনও ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "সেদেশের কোনও ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।" তিনি বলিলেন, "আপনার নাই বটে, কিন্তু আপনার বাবার ছিল।" তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন; সদর মহলের তেতালার একটা নির্জ্জন ঘরে (যে ঘরে বসিয়া তিনি লেখা পড়া করিতেন) প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি দোতালায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় রাত্রি আটটার সময় দ্বার খুলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল, এবং উনি কে? কোনও উত্তর পাইলাম না। ইহার দুইমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

আমার অগ্রজের ধারণা ছিল যে, তাঁহার গুরুদেবের সহিত পিতৃদেবের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, নতুবা যে ধর্ম্মে তিনি ব্রতী ছিলেন, উহা কোথায় পাইলেন? যাহা হউক, পিতৃদেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

অর্জ্জুনা পুষ্করিণী

অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র "বারুণী" পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। "বারুণী" পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। গ্রামোপান্তে অতি নির্জ্জন স্থানে উহার খনন হইয়াছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে উহা খাত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অর্জ্জুনা পূর্ব্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল; জল দেখা যাইত না; পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত; আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারি দিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জ্জন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজ্জিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ-আয়তন হইয়াছে, এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নাই।

"অর্জ্জুনা"র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল। উহাতে

একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীও ছিল, এক ব্যক্তি উহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারিত, কোনও কষ্ট হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঐ বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা একটি উৎকৃষ্ট ফুলবাগান করিয়াছিলেন। তের চৌদ্দ বর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ টাকা হইতে, এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলী কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ বাগানের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দিকে বড় বড় মনসা-কাঁটার বেড়া ছিল, আর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিতের উপর রেলিং ছিল এবং একটি ফটক ছিল। এই রেলিংএর পরই, অর্থাৎ বাগানের দক্ষিণেই 'অর্জ্জুনা'। মাঠাল গ্রামে যাইবার জন্য কেবল মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন এবং যতদিন না তাঁহাদের বসতবাটীর সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন, ততদিন এই ফুলবাগানে সর্ব্বদা থাকিতেন। ঐ ফুল-বাগানের এক্ষণে আর কোনও চিহ্ন নাই, ঐ জমীতে এখন প্রজা বসিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অনাদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু উহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল।

দিন কতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝিবা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরব্ধ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের 'আইভান হো' পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে 'আইভান হো' পড়ি নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে 'দুর্গেশনন্দিনীর' নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম, "না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন, —"সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি 'আইভান হো' পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার

'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক হইলাম। 'বঙ্গদর্শনে' "বিষবৃক্ষ" প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—"ঐ আবার 'কুন্দনন্দিনী' একটা কি বাহির হইতেছে?" তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধ হয় কখনও যাইবে না। 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম যে ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান-

বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম, এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরা ত মানুষই নহি। তথাপি ঐ 'কলেজ রি-ইউনিয়নে' যাইতাম। যাইতাম ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়; যাইতাম—কৃষ্ণবন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কলেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টি বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।

কিন্তু ও সকল কথা এখন থাক্। আমি দ্বিতীয় 'কলেজ রি-ইউনিয়নে'র সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—'আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান্ রাগাদি (tableux vivantes) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি আপনার কোন উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন বোধ হয় 'চন্দ্রশেখর' পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺শ্রীকৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিমবাবুর দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়।

বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু, ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষা-গ্রামনিবাসী ৺রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার সহোদর সদৃশ দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকিল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোন্ মোকদ্দমায় আসিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'আমরা কোন মোকদ্দমায় আসি নাই, আমার নাম—।' 'চন্দ্রবাবু!'—এই বলিয়া উঠিয়াই দাঁড়াইয়া মহা সমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা। সদর বাড়ীর বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯ঘণ্টার সময় পৌছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শোতৃবর্গের মাথায় উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, 'উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।' আবার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এইভাবে বিভোর—"আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া এক জন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা, সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ

করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনারা, যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না। রবিবার উকিলদের বাড়ীতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।" কাঁটাল-পাড়ার বাটীতে অনেকবার গিয়াছিলাম, একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, —তা, হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া ব'স।' দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন,—উনি আমাদের বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আব্‌দার রক্ষা করেন, রোগে শোকে, বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।" এমন সরলভাবে এমন ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন —"অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।"

বঙ্কিমবাবু যে সময় কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমায় বলিয়াছিলেন—'যাইতেছ যাও, কিন্তু ও কাজে থাকিতে পারিবে না।' আমি ছয় মাসমাত্র ডিপুটীগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিনকতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাসা করেন। তুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানা, এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে তুইখানা বাড়ীর পর একটি বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর-বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত। উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন—'সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনারগুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা-বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন, আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবারে সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমায় দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকটে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন,—'এস।' আমি

বলিলাম—'যাব কি না তাই ভাবছি।' যাইবামাত্র হাসি, আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব।

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহার কাছে কখনই খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবারমাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন :—'বঙ্কিমবাবু কি বন্ধুবৎসল!' একবার সন্ধ্যার কিছু পরেই পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন, আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখই হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলে ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল—সন্ধ্যা আগত-

প্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব্ব কমনীয়তামিশ্রিত অসীম প্রতিভা ও পুরুষকার-ব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্ত্তি! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন,—এই রকমই ত চাই।

সাহিত্যের সংস্রবমাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার আফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুইখানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমবাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন?' তিনি বলিলেন—'দুই তিন ঘণ্টা হইবে।' সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট যুবক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ স্থির ধীর প্রফুল্ল ভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, যুবকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমায় বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব ?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন প্রেসে এক জন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।' বঙ্কিমবাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধুস্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটীতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম-ভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা করিয়া-ছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায়, এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানাশাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার

বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কলিকাতায় থাকিলে তিনি; তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবি হেমচন্দ্র, কোমৎমতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সর্ব্বদাই সেখানে থাকিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।

চন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা

আমরা এরূপ কল্পনাপ্রিয় জাতি, রচনায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করা এত তুচ্ছ পদার্থ মনে করি যে, আমাদের দ্বারা কাহারও জীবনচরিত লেখা, বোধ করি, হইতেই পারে না। বঙ্কিমবাবু ত অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, সত্য মিথ্যা তাঁহাতে সকলই সাজে; তাহার পর, আজি ১৭।১৮ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অলীক-বাদ যে উঠিবে, আশ্চর্য্য নহে। আমি সামান্য ব্যক্তি, এখনও 'জলজীয়ন্ত' জীবন্ত রহিয়াছি, আমার সম্বন্ধেও বিস্তর মিথ্যা কথা শুনিতে পাই। তাহাতে আবার আমার পিতৃদেবকে লইয়া টানাটানি করা হয়।

আমার বন্ধু, জ্যেষ্ঠসহোদরোপম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত গোপাল উড়ের টপ্পার পরিশিষ্টে লিখিতেছেন,—"এক সময়ে উমেশ ভুলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল; ফলে, গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা খ্যাতনামা ৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় নিজ বাড়ীতে এই উভয় দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।" সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ মিথ্যায় আবার একটু ক্ষতি আছে। আমাদের

বাড়ীতে তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত যাত্রার দলের গাহনা হইয়াছিল, অথচ পিতৃদেব কখনও গোপাল উড়ের গান বাড়ীতে দেন নাই। কেন দেন নাই, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। তবে আবার তিনি বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই দলের বায়না করিবেন কেন?

একটা আমার নিজের কথা বলি। "আর্য্যাবর্ত্তে" "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের কথাবার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে। বিপিনবাবু বলিতেছেন,—"পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law Lectures শুনিতে আসিতেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার Law Lectures? বঙ্কিমবাবু?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ; আপনার।' তিনি বলিলেন, 'না, কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?' আমি বলিলাম, 'এক জন প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেক্‌চার শুনিতেন।' তিনি বলিলেন, 'দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law-lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law-classএ লেক্‌চার শুনিতে যাইতাম।' প্রবীণ সাহিত্যসেবী এই অধম। আমি "পিতা পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। * * * তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়—তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টারী লইতেন। কৃষ্ণকমল বাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—'আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!' কৃষ্ণকমল বলিলেন, 'আচ্ছা।' অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন।"

এরূপ ভুল বা ভ্রম হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়; বিশেষ, আমার প্রবন্ধ যখন ছাপান রহিয়াছে। তাহার উপর "আর্য্যাবর্ত্ত"-সম্পাদক এক জন কৃতবিদ্য প্রবীণ সম্পাদক; তিনি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এরূপ ভুল তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাওয়া আরও ক্ষোভের বিষয়। আসল কথা, আমরা সত্য মিথ্যার ভেদ করা তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে যাওয়া এখন একরূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে আরও বাড়াইতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা। ১৩০২ সনের বৈশাখে শ্রীমান হারাণচন্দ্র লিখিলেন, "সেই দুই মাস মাত্র পড়িয়া মেধাবী বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।" এই শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীমান

শচীশচন্দ্র লিখিতেছেন,—"পরীক্ষায় দুই জনমাত্র উত্তীর্ণ হইলেন, তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন বঙ্কিমবাবু, দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।"

এখন প্রকৃত কথা সরকারী বিবরণ হইতে শুনুন:—

"The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the poor results of the first examination, in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour".—*Report by the Bengal Provincial committee. 1884. Page 14. Para 45.*

এমন করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া চরিত লেখা চলে না। তাহাতে এমনও কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি বঙ্কিমবাবুকে খাট করিবার জন্য এইরূপ কথা লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্কিমবাবুর মত মনীষী পাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া বি, এ, পরীক্ষার কঠোরতা কমিয়া গেল, এবং আমার মত কত শত অভাজন বি, এ, পাস করিয়া কৃতার্থ হইল। আসল কথা, সত্য জানিতে পারিলে প্রকাশ করাই ভাল। তাহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না।

কিন্তু সকল কথার প্রতিবাদ ত আর সরকারী বিবরণ দেখাইয়া করা যায় না। অথচ বঙ্কিমবাবুর চরিতে বা চরিত্রে অনেক মিথ্যা যোজিত হইতেছে। সেইগুলির প্রতিবাদ করিবার উপায় কি? ধরুন একটা কথা উঠিল—বঙ্কিমবাবু কেমন সাহসী ছিলেন। আমি

চরিত-লেখক হইলে, হয় ত এ সকল কথা তুলিতাম না; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তুলিলে সেই কথার কোনরূপ উত্তর না দিলে চলে কই? বঙ্কিমবাবু এক জন বিশেষ সাহসী পুরুষ ছিলেন, এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। এখন যাহাকে 'সাধুভাষা'য় nervous বলে, তিনি সেইরূপ nervous ছিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চড়িতে একেবারে পারিতেন না; পর্ব্বতে কখনও উঠেন নাই। কিন্তু তিনি nervous বলিয়া যে ভূত-ভয়-গ্রস্ত ছিলেন—এমনটা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ললিতা" প্রকাশিত হয়। এক খণ্ড আমার আছে। তাহাতে ভৌতিক গল্প, এমন কোন কথা নাই। ২২ বৎসর পরে, বঙ্কিমবাবু যখন প্রবীণ, তখন ঐটির পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করেন। অনেক স্থলে খোল্ নল্‌চে—দুই বদলাইয়া দেন। তাহাতেই ছাপা আছে,—"ললিতা। ভৌতিকগল্প!" এই ভৌতিক কথা লইয়া, কোনও ভূতের ব্যাপারের সহিত গল্পের সম্পর্ক আছে, বুঝান হইয়াছে।

ঐরূপ বুঝান ভুল। প্রথম কথা, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন "ললিতা" ছাপান হয়, তখন "ভৌতিক গল্প" নাম ছিল না; "পুরাকালিক গল্প" নাম ছিল। তাহার পর বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায় কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ীর দক্ষিণে খাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল। তাহাতে আশে পাশে দুই একটা ঝোপ থাকিলেও, বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না। আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নহি। তবে বঙ্কিমবাবুরই মুখে

শুনিয়াছি, তিনি সকালে বিকালে সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্প-শয্যায় ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকিতে, ভালবাসিতেন। আর সেই যে প্রাণ ভরিয়া স্বভাবের শোভা-সন্দর্শন, তাহাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই প্রভাতের বালারুণচ্ছটা, সেই সন্ধ্যা-গগনের রক্তিম আভা, সেই ঢল-ঢল দূর্ব্বাদলময় প্রান্তরের সবুজ-লীলা, সেই চারিদিকের গাছপালার বিচিত্র হরিত সমন্বয়, মাথার উপর মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলা-খেলা—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী। কিন্তু আমরা তাহা দেখি কি ? দেখি না। বঙ্কিমবাবু বয়সকালে কিঞ্চিৎ colour-blind বা রঙ্গ-কাণা হইলেও অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইতেন। শীতল-সমীরণের নিয়ত সর্-সর্ শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন্-স্বন্ স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যার কুল-কুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, কচিৎ উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষপুটধ্বনি, এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্-শন্ গতি-শব্দ—বালক বঙ্কিম কাণ ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া শুনিতেন, উপভোগ করিতেন ; করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তিনি যেরূপ সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আর কয় জন বাঙ্গালী সেরূপ করিয়াছেন, আমি জানি না। কাঁটালপাড়ার সেই প্রান্তরটুকু, বাঙ্গালীর পুণ্যক্ষেত্র—গাছপালায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে ; তোমরা সকলে এই বেলা একবার দেখিয়া আসিও।

বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যাবস্থা হইতেই স্বভাব-সৌন্দর্য্যের সেবক। এই সেবার গুণে তিনি সকলরূপ সৌন্দর্য্যের উপভোগ

করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য এক জন প্রকৃত সাহিত্য-সেবক। এখন বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্ব ব্যাপারে প্রসার পাইয়া নিতান্ত অগভীর হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এইরূপ প্রসারবৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের সমীচীনতায় আমরা সন্দেহ করি। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় আবার ইহার বিপরীত ছিল; বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসার তখন প্রায় কবিতা পর্য্যন্ত ছিল। যাত্রা, গান, কীর্ত্তনের কথা এখন ধরিলাম না। তখন বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন কবিতার চর্চ্চার নামই ছিল সাহিত্য-চর্চ্চা। পূর্ব্ব হইতেই কাব্য-গ্রন্থ-পাঠ আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার সীমা ছিল। "কেবল পাঠশাল বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিত; বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদী মুদীখানায় পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর ৺শিবের মন্দিরের ধারীতে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড়মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণু-মন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজীঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গীত ও পঠিত হইত। বহুকাল এইরূপ চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্য সাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

তাঁহার কর্ত্তৃক বঙ্গ-সাহিত্যে ঢল নামিল; স্রোত চলিতে লাগিল, একটা জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া

করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিষয়ের আন্দোলন হয়, গুপ্ত কবি তখন সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন; সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারই প্রমাণ দেন। তাহার পর, বর্ষার সময় বর্ষা-বর্ণন, গ্রীষ্মে গ্রীষ্ম-বর্ণন, বড় ঝড় হইলে ঝড়-বর্ণন করেন। ১লা বৈশাখের 'প্রভাকরে' সমগ্র পূর্ব্ব বৎসরের ঘটনাবলির কাব্য-চিত্র প্রদান করেন। কেহ খৃষ্টান হইতে গেলে, তখনই তাহার বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচিত হইল। বিধবা-বিবাহের গোল উঠিল, ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমাগত সেই বিষয়ে পদ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কবিতা এখন আর নরবানরের যুদ্ধ লইয়া বা কৌরব-পাণ্ডবের বিবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না—বাঙ্গালার সকল কথাই এখন বাঙ্গালা কবিতাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কবিতা একটি জীবন্ত পদার্থ হইল। বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের সহিত বাঙ্গালা কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।"

এই ঈশ্বর গুপ্ত যখন সম্রাট্, তখন বঙ্কিমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন স্বভাবের সৌন্দর্য্য-উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া সাহিত্যের রস-উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। "প্রভাকরে" পদ্য লিখিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমের মত সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাকরেদ। বঙ্কিমবাবু নিজে বলিতেছেন—

"দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার

জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকটে ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলিতেছেন,—

"যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক—স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভার তাহাদের উপরে পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্ব-প্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তি-শক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনা-শক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা-রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারিকানাথ অধিকারীকে, এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনি প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা-প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ দেশী কথায় দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত

থাকিলে বোধ হয় তিনি এক জন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।”

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন। বঙ্কিমের কোন কোন চরিত-লেখক বলিতেছেন, হুগলি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। আমি বলি না। কেন বলি না, তাহা বুঝাইতে গেলে কেবল খুঁটিনাটিতেই আমার প্রবন্ধ পূরিয়া যাইবে, সে ত ভাল হইবে না। চরিত-লেখক নিজেই বলিতেছেন,—বঙ্কিমবাবু, ৫৭ সালে বি, এ, পরীক্ষা দেন, আর ঈশানবাবু “১৮৬৪ সালে হুগলী কলেজের হেড্‌মাষ্টার পদে নিযুক্ত হন।” তবে ঈশানবাবুর কাছে বঙ্কিমবাবু শিখিলেন কবে? যাউক, ও সকল অসাবধানতার কথা আর তুলিব না।

বঙ্কিমবাবুর প্রথম গ্রন্থ—

“ললিতা

পুরাকালিক গল্প—

তথা

মানস”

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ‘তথা’ কথাটি অনুধাবন

করিবেন। 'তথা' অর্থ—এবং বা ও। ললিতা—পুরাকালিক গল্প, মানস তাহা নহে।

এই গ্রন্থ "কলিকাতা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৫৬।" সালে। সেই সময়ের লেখা গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন অনুসারে এবং ২২ বৎসর পরের লেখা অনুসারে, এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, "লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।" বঙ্কিমবাবুই বলিতেছেন—"প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই।"

গ্রন্থের বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন দেখিলে, পরে বলিব; আপাততঃ সেই গ্রন্থে গ্রন্থকার-লিখিত গদ্য বিজ্ঞাপনই আমাদের আলোচ্য। সেই বিজ্ঞাপনটি এই,—

বিজ্ঞাপন

সু কাব্যালোচকমাত্রেরই **অত্র** কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর **সুতীর্ণ** হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত

হইবার তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইত প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।”

বি, এ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উপরের ঐ বিজ্ঞাপনটী থাকিলে, সকলেই হয় ত মনে করিতেন যে, ওটি পরীক্ষকদিগের মন-গড়া সদোষ লেখা। তাহা নহে; ওটি পরে গদ্য-লেখার সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত বিজ্ঞাপন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি কবিতা দু'টি লেখেন; তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ তাঁহার যখন আঠার বৎসর বয়স, তখন বিজ্ঞাপন লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার পরই বর্ষকালমধ্যে তিনি বিএ পরীক্ষা দেন। এখন একবার এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক।

খুচরা গদ্য বা কড়্চার কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম যুগের গদ্য-লেখক রাজীবলোচন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় সপাদ শতবর্ষ এই যুগের পরিমাণকাল। ১৮৪৩ সালে “তত্ত্ববোধিনী”র প্রকাশে বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বঙ্কিমবাবুর ঐ লেখাটি ১৮৫৬ সালের; মধ্যে একটি ছোট খাট যুগ অর্থাৎ বার বৎসর গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ,

অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শম্যান সাহেব, য়েটস্ (Yates) সাহেব প্রভৃতির কথা ধরিব না। মুক্তারামের 'আরবীয়োপাখ্যান' ও 'অপূর্ব্বোপাখ্যান', মদনমোহনের 'ঋজুপাঠ' বা তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ। তখনও আদর্শ, এখনও আদর্শ। তারাশঙ্করের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রাপ্ত-পারিতোষিক প্রবন্ধ যেমন সরল রচনার দৃষ্টান্ত, তাঁহার 'কাদম্বরী' তেমনই শব্দচ্ছটায় এবং ভাবঘটায় মোহকরী। ১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়,—ইংরাজির এইরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। তাহার পর 'বেতাল-পঁচিশ' ও 'বোধোদয়'। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন 'মাসিক পত্র' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি প্রকাশিত করেন। বঙ্কিমবাবু বহুপরে বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। অক্ষয়কুমারের তিনখানি 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রকাশিত হইয়াছে; আর বোধ করি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' ও 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। তা' ছাড়া এই সময়ে 'তত্ত্ব-বোধিনী' ও 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ত ছিলই, 'এডুকেশন-গেজেট'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঠিকঠাক বলিতে পারি আর নাই পারি, বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন লেখার সময় বাঙ্গালা গদ্য বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাইতেছিল। বাঙ্গালায় গদ্য, একটা শিক্ষার উপায়,

এবং উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল। সাহিত্যের প্রসার এখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই, গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে ঘোষিত হইতেছিল।

১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল যে 'অত্র কবিতা'য়, 'হইবায়' এইরূপ শব্দ দেখিয়া বলিতেছি, এমন নহে। 'হইবেক', 'জন্মিবেক' এরূপ কান্ত পদ আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। তাহার জন্যও বলি না। সমস্ত লেখাটী পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।

'অত্র কবিতা', 'মনোনীত হইবায়' ইত্যাদি পরিষ্কার আদালতি বাঙ্গালা; তাহার পর আমরা যখন উপসংহার পাঠ করি,— "অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে (গ্রন্থকার) প্রস্তুত নহেন", তখন মনে হয়, কোন বালক আসামী রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সমক্ষে, উকীলের শিক্ষামত কাতরতা জানাইতেছে। লেখাটিতে আদালতি ঢং জাজ্বল্যমান।

তাহার উপর আছে—পণ্ডিতি ঢং। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে টোলের

পড়া বঙ্কিমবাবু অনেক পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা দেখিতেছি—তাঁহার ভাষায় পণ্ডিতি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। 'সুকাব্যালোচক' পণ্ডিতি বেশ, কিন্তু বাঙ্গালা নহে। "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"—'সু' দেখিতেছি, তাঁহার হাতে পড়িয়া প্রায় 'কু' হইয়াছে। 'সুকাব্যালোচক', 'সুত্তীর্ণ' আর 'সুরসজ্ঞ', এরূপ 'সু' ত ভাল নহে। 'সু' ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। 'কাব্যালোচক'—যে আলোচনা করে, সে অবশ্য শাস্ত্রমত আলোচক; কিন্তু এইরূপ শাস্ত্র লইয়া আমরা ত লেখা-বলা করি না; কাব্যালোচক কথা ত তাহার পরে আর খুঁজিয়া পাই না। 'পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ়'—বেশ পণ্ডিতি বটে, কিন্তু যে পাণ্ডিত্যবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে লেখেন,—"পদবীতে পদার্পণ", তাহা ত "পদবীরূঢ়" পদে পাওয়া গেল না। নব্য লেখকগণকে বঙ্কিমবাবু উপদেশ দেন, "যাহা কিছু লিখিবে, সুন্দর করিয়া লিখিবে";—"পদবীতে পদার্পণে" যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা "পদবীরূঢ়"তে নাই।

এ সমালোচনা এই পর্য্যন্ত। আমরা কেবল এইমাত্র দেখাইতে চাই,—যিনি এক সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের শায়েনশা সম্রাট হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেই ঐশ্বর্য্যময় গদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলাই করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না, গুপ্তের শিষ্যত্ব-স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত

সাহিত্যও তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজী কবিতা, সেক্সপিয়র হইতে বায়রন, তিনি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা, গান, কীর্ত্তনের কথা এখন বলিব না।

এ প্রবন্ধ এইখানেই থাক। দুইটা কথা আমি প্রথমে বলিলাম,—(১) বঙ্কিমবাবু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—কর্ত্তৃপক্ষের favour বা অনুগ্রহে তিনি উত্তীর্ণ বলিয়া পরিচিত হন। এই কথাটির সরকারী দলীলী প্রমাণ দিয়াছি। (২) আর একটা কথা আমার অনুমান; বঙ্কিমবাবু তাঁহার আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনা করেন নাই।

এই দুইটা কথায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার কি কিছু অবমাননা করা হইল? আমি বলি, তা ত নয়ই—প্রত্যুত তাঁহার প্রতিভার গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রতিভা দুই ভাবে বুঝা যায়,—(১) "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।" Inventive genius (২) আর এক কার্লাইলের মতে—"Indefategable exertion in pursuit of an object।" আমি যত দূর জানি, তাহাতে বুঝি—এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।

উপসংহারে একটি নিবেদন করিব,—বঙ্কিমবাবুর আত্মীয় অনাত্মীয় নব্য লেখকেরা বঙ্কিম-চরিত লিখিবার সময়, একটু দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত যেন লেখনী চালনা করেন; আমরা

কল্পনাপ্রিয় জাতি, সত্যমিথ্যার প্রভেদ আমরা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না,—এইরূপ একটা জাতীয় বা বিজাতীয় কলঙ্ক যে আমাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে, বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কনে সেই কলঙ্ক যেন স্পষ্টীকৃত করা না হয়। এই ভাদ্রের চতুর্থীর চন্দ্র আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি, কলঙ্ক আমাদের নিয়তই লাগিয়া আছে,—আপনাদের কৃত কার্য্যে সেই কলঙ্ক আবার বাড়াইব কেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যান। তিনি এরূপ সভায় কখনও মিশিতেন না। কেন, তাহার আভাস, প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাঁহার যাওয়া আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম-চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিমবাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, ঢল ঢল রূপ দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপের মর্য্যাদা কম?

"দেবের দুর্লভ নিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে।
নরের নিষ্ঠুর করে পাছে লণ্ডভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে ঘিরেছে।"

এইরূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব ঋতুবর্ণনে গোলাপের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম সম্বন্ধেও যদি তাই হয়? যদি সামাজিকদের

হাতে লণ্ডভণ্ড হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক আবরণ দিয়া, ঘিরিয়া রাখিয়া থাকেন? অন্ত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা হয় না। কোন সত্য কথাতে, কাহারও হানি করা হয় না; বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া, তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত পরিচয়-কাহিনী গোড়া হইতেই বলা ভাল।

৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্‌সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুই জনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন, বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন, এবং কাছারীর নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটী বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটী বাড়ী ঠিক করিয়া, ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম, জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটী ঠিকা চাকরকেও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণ-পণায় মুগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দসহকারে, এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি, এল পাশ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন;

বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিন জন ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিস-পত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। হায়রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে! এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটী কথাও কহিলেন না, অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা-কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন, "বঙ্কিম গেল হে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।" "তোমার সহিত দুদিনে একটীও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম, "কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয় ত, তাঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।" পিতা বলিলেন, "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরতা পিতা পুত্র দুই জনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা, অসুবিধা কত দূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায়

তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্র্যাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল, বঙ্কিমবাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিন জনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—

"কাদা মাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হল না!"

এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজোব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটী হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয় ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে, নয় ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড

ক্লাসের বিশ্রামঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেণল্ডের কথা। তখন দুই জনে অসি-ধার রেণল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক, দুই জনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে, দুই জনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন দিন সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট, তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর 'বন্ধুবৎসলতা'র পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতার অচিরাৎ একরূপ পরিণতি হইয়াছিল। দুই দিকে তাহার দুইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথার একটু সবিস্তার পরিচয় এক্ষণে দিব। পাঠক, আবার বলি, আমার আত্মম্ভরিতা আবার মার্জ্জনা করিবেন।

বহু পরে বঙ্কিমচন্দ্র "লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে"র ভূমিকায় বলিতেছেন,—"উহাতেই (আলালের ঘরের দুলাল হইতেই) প্রথম এ বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়। বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর

এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের ছুলাল। ইহার কেহই আদর্শ-ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের ছুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেথক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" ছুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিথিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ", "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থসংগ্রহে" বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থকুলাধম আমি ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভক্তি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি। মৃচ্ছকটিক নাটকে দেথিবেন, প্রাড়্বিবাকের পার্শ্বোপবিষ্ট কায়স্থ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হউন, দীনবন্ধু হউন, প্যারীচাঁদ হউন, আর রাজেন্দ্রলালই হউন, আমাদের প্রাকৃতের দিকে একটু টান আছে। আমরা বুঝি ধর্ম্মকার্য্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটাছন্দবিভূষিত কবিতায়, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন। কিন্তু গুরুজন লইয়া ত সংসার হয় না। প্রধানতঃ পুত্র কলত্র, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব, এই সকল লইয়াই ত সংসার। এ সকল ত সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। তা বলিয়া কেবল বিষয়কার্য্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গলার প্রয়োজন, এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান, অর্থাৎ প্রাণ।

যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায় সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার বিতর্ক অনেক দিন চলিল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে "গরু ঠেঙ্গাইতে" লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়; ছাপান হয় নাই।

মধ্যবর্ত্তিনী ভাষার সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন"-প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। কয় জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃষ্টান ব্রজমাধব বাবু প্রকাশক-রূপে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
লেখক—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জগদীশনাথ রায়
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
" রামদাস সেন
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আর সকলে নামজাদা, কেবল আমিই নামহীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া

আমি "উদ্দীপনা" প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসী।

আমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চুপি চুপি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দেখাইলাম। 'ভোগ্য' 'ভোজ্য' এই দু'টা কথায়, আমি একটা কি গোল করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ ভুলই করিয়াছিলাম। তিনি সেটি সংশোধন করিয়া দেন। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল। ওদিকে পিতাকে "বঙ্গদর্শন" পাঠান হয় নাই। তিনি চটিয়া আমাকে লিখিলেন—

"Why does not my friend Bankim Chandra send his Bangadarsan to me? I am able to understand it and can afford to pay for it."

ঐ ক্ষুদ্র কথা কয়টিতে পিতার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং বন্ধুর সামান্য অবহেলায় "রাগ" বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বঙ্গদর্শন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল, এবং তিনি পাঠ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর মাতাঠাকুরাণীর বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। ৮০ সালের বৈশাখ হইতে "বঙ্গদর্শনের" দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমবাবুদিগের বাড়ী কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

সঞ্জীববাবু কাঁটালপাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক, অর্থাৎ আমি বাড়ী বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে "সাধারণী" প্রকাশিত হইল। আর সেই মাস হইতে, আমি "বঙ্গদর্শনে"র প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম। "সাধারণী"ও "বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে" কাঁটালপাড়ায় ছাপা হইতে লাগিল। ৮১ সালের শ্রাবণ মাসে, আমি চুঁচুড়ার কদমতলায় আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন আমাদের আর একটী বাড়ীতে, "সাধারণী যন্ত্রালয়" স্থাপনা করিয়া "সাধারণী" প্রকাশ করিতে লাগিলাম।*

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

---

* "বঙ্গভাষার লেখক" প্রথম ভাগে প্রকাশিত "পিতা পুত্র" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটী ষ্টেশন হ'তে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ী প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজারখরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা

হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাদি লাগিয়া যায়, আট দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়ি-মুড়্‌কি, মটর-ভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশী, কাগজের পুঁতুল, কাঠীর উপর লাফ্‌ দেওয়া হনুমান্‌, কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটী বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রি হয়—নানা রকম গাছের কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপ-জামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল্‌সার গাছ, এবং গোলাপ, যূঁই, জাতি, বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ, বক, কুরচি, কাঞ্চন, টগর, সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনও গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল-নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল নাচ হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এ সব ত ছিলই; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ্‌ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর

জবানবন্দী হইল, উকিলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ্‌ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে, আর হাসে।

রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন, কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কুঞ্জ ছিল; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক্ নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল—গুণ্ডিচা; অর্থ, কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ী লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আটদিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে; সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝী, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া যায়। কোন দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে

সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারি দিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জম্‌জমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিম দিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিব-মন্দির-সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্ব্বদিকে দুটি দরজা একে-বারে খোলা জমীতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিম দিকে দুইটি জানালা, ঘরটি পূব-পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা, ঘর দুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে এক-খানি খাট থাকিত, পূবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পূবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন. দুই এক জন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে

যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে সময়ে অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে-কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ সব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আল্‌সে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথা, হাতখানেক উচা, তাহারও আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উচা, তাহারও মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমী ছিল, তাহাতে শুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমীতে যুঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটী গন্ধে ভরপূর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগান-

টীকে বড়ই ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন, বাগানটী খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আল্‌সেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেল-ওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন, জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলে-পিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না! একবার ধরণী কথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণী কথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহিরবাড়ীর পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়ীতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর এক-খানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি

কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত ; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণী কথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি ? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি, বাড়ী হইতে কিছুদূর, পূর্বদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরণী কথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোন দিন সে দিকে যাই নাই। চারি পাঁচ দিন ধরণী কথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোন দিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই, তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's Character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি.বি, এ পাস করিলাম; উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ্ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন, সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্প্‌লকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম, রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন, এবং কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন, এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম, এম এ ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরী পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ ক'টি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ ক'টি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ

এম, এ, মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম,এ,; আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র "আর্য্যদর্শনে" আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কালজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক, তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি ; শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যয় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই, বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন, এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাটী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমার

জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, 'আর্য্যদর্শনে' যাহা লয় নাই, 'বঙ্গদর্শনে' তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে, তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণ বাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ী নৈহাটী, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি, এ, পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হাঁ।" তখন বঙ্কিম আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি, এ, পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" আমি

মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয়? কেন?" "শুনিয়াছি, কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটী? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টচার্য্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটী রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটী প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "বাঙ্গালা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে।" বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম, এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই

লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।” তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “নন্দের ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক, আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।” আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক শিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম। রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচারব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল “রামফক্কড়”। নৈহাটী ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়ীতেই তাঁর অবারিতদ্বার ছিল। তিনি সব বাড়ীতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ী যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। এক দিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিলেন, “তুমি বঙ্কিমকে কি দিয়া আসিয়াছ?” আমি বলিলাম, “একটা লেখা।” তিনি বলিলেন, “তাই বটে। বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল, ‘নন্দর ভাইটি বেশ বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছে’। তুমি সেখানে যাও না কেন? বোধ হয় গেলে সে খুসী হবে।” রাম বাঁড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর এক দিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে! তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?” আমি বলিলাম, “আমি

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন "ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে, বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা ভাবটা একবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উন্টাইয়া উন্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি, সে রূপা, এ সব কাঁচা সোনা।" বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটী হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি-রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ায় শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল

শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই এক জন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন, এবং ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি, কীর্ত্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্‌গুন্ করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই

ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স্" (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবনসঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" বলিয়া "বঙ্গদর্শনে" সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে। তখন সব অন্ধকার ছিল, তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। "বঙ্গদর্শন" তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার "ভারতমহিলা" লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে

যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয় ; কেন না, "বঙ্গদর্শনে"র গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও "বঙ্গদর্শনে"র টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয়, তিনি ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটীগিরিটি যায়। * তখন দিনকতক তিনি

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স্ অ্যাক্ট' পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন ; সঞ্জীববাবুও এক জন কমিশনার হইলেন। এক দিন কমিটীতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে ; সঙ্কল্প হইল ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন, "আর ৭৫৲ টাকা চাই, কারণ, বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে ? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না Daughter-in-law's Lane বলিতে হইবে।" জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি, আরও ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন ?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে ? উহাকে Black-footed friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপী লইয়া কমিটী হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব, ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া

সব্‌রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই "বঙ্গদর্শন" এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ "বঙ্গদর্শনে"র সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে "বঙ্গদর্শনে" লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পুর্ব্বেও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, "বঙ্গদর্শন" এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন "বঙ্গদর্শনে" নূতনের মধ্যে আমি; আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন "বঙ্গদর্শন" বাহির হইবার প্রায় বছর খানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি, এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি "কৃষ্ণকান্তের উইল" আনিয়া আমাকে দিলেন, "রেল-

---

উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীবাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটর তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন, আছে।

গাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির বাহির হইল।” আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই আমার বাড়ীতে নাই। বৌঠাকুরাণীরা অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন; এখন পুত্রেরা বড় হইয়া কতকগুলি আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন। আমার এত যত্নের জিনিস একখানিও বাড়ীতে নাই!

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম, তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবী বন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম; দেখিলাম চুঁচুড়ায় যোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন; একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি একতালা। বাড়ীটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্ব্বের দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেদিন তার নীচে খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু ‘কৃষ্ণকান্তী’ আছে?” তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।” আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি"—অর্থাৎ, তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিন জন কবি বাইরন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

আমার বাড়ী নৈহাটী, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী হ'তে পোয়াটেক পথ তফাতে। তাঁহার পিতার কি নাম ছিল, লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে রায় বাহাদুর বলিয়াই জানিত। রায় বাহাদুর দেশের এক জন বড় লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ ছিলেন। রাধাবল্লভের রথ হইত, দোল হইত, বার মাসে তের পর্ব্ব হইত। রাধাবল্লভের মন্দির ছিল, গুণ্ডিচা-ঘর ছিল, একখানি বড় আটচালা ছিল, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা ছিল, যেখানে রথ-দোলে মেলা বসিত। রায় বাহাদুরের বাড়ীতে মাঝে মাঝে কথকতা হইত। এগার বৎসর বয়সে, যখন আমি কাঁটালপাড়ায় টোলে পড়ি, তখন একবার ধরণী কথকের কথা হয়। তখন আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত প্রায়ই কথা শুনিতে আসিতাম। কথকতার আসরে বঙ্কিম বাবুরা চারি ভা'য়েই থাকিতেন। আর কিছু বুঝিতে পারি আর না পারি, কথাটা যে বেশ জমিত, তা বেশ মনে হয়। কথক মহাশয় গান করিবার জন্য 'হাঁ' করিলেই, সমস্ত আসর নিস্তব্ধ হইয়া যাইত; মাঝে মাঝে লোকে 'বাহবা বাহবা' 'বেশ বেশ' বলিতে থাকিত।

সুতরাং এই সময় হইতেই আমি বঙ্কিম বাবুদের চারি ভাইকেই চিনিতাম, এবং তাঁহাদের বাড়ীর খবরও অনেক শুনিতে পাইতাম। আমাকে কিন্তু তাঁহারা চিনিতেন না।

১৮৭৬ সালে, যখন আমি এম্ এ পড়ি, তখন তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ হয়। সেই সময় হইতেই ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়, তখন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। ১৮৭৬ সালে একটি বড় প্রবন্ধ লইয়া তাঁহার নিকট যাই। তখন তাঁহার চতুর্থ সালের "বঙ্গদর্শন" ৯ মাস বাহির হয় নাই। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, তিন মাসের প্রবন্ধের অভাব। আমার প্রবন্ধ সে অভাব পূরণ করিয়া দিল, এবং বঙ্কিম বাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এক বৎসর "বঙ্গদর্শন" আর বাহির হইল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিকটে যাতায়াত বন্ধ রহিল না। আমি শনিবারে বাড়ী আসিলেই, এইখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। তিনি তখন হুগলির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; বাড়ী হইতেই যাতায়াত করিতেন। আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য, পদ্য, গদ্য, নাটক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম। কয়েকটি লোক ছিলেন, আমি আসিলেই তাঁহারা উঠিয়া যাইতেন, বলিতেন, 'এই-বার কেতাবী কথা আরম্ভ হইবে, আমরা আর বসিয়া কি করিব?' সাড়ে নয়টার সময় বঙ্কিম বাবু তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া আমার বাড়ী রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়া অন্দরে যাইতেন। অন্দরের খুব কড়া শাসন ছিল, সাড়ে নয়টার পর তিনি এক মিনিটও বাহিরে

থাকিতে পারিতেন না। দুই পাঁচ মিনিট যদি কখন তাঁহার দেরী হইত, অমনই চাকরাণী আসিত।

বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে কায়া বদল করিয়া "বঙ্গদর্শন" আবার বাহির হইলেন। এবার সম্পাদক হইলেন তাঁহার মেজ দাদা, সঞ্জীব বাবু। কিন্তু লেখার ভার, অনেকটা তাঁহার উপরেই রহিল। তিনি আমাকে লিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিম বাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল—হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিম বাবুকে খুসী করিব। তিনি যদি কখন কোন প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম। অপ্রশংসা করা বা গালি দেওয়া, কখনও তিনি করেন নাই। যে বার কিছু বলিতেন না, বুঝিতাম, লেখাটা ভাল হয় নাই। সেবার চেষ্টা করিয়া জেরা করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম।

দুই বৎসর এরূপ গেলে, আমায় এক বৎসরের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইতে হইল। সেখান হইতেও আমি প্রায়ই লেখা পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর মতামত কিছুই শুনিতে পাইতাম না। তিনি আমাকে চিঠিপত্র দিতেন না, আমিও তাঁহাকে বড় একটা চিঠিপত্র দিতাম না। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বঙ্কিম বাবু চুঁচুড়ার যোড়াঘাটের উপর বাসা করিয়াছেন। "বঙ্গদর্শন"

বাহির হইতেছে, কিন্তু মাসে মাসে বাহির হয় না ; অনেক বাকি পড়িতে লাগিল। আবার এক বৎসর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর-বৎসর হইতে আবার "বঙ্গদর্শন" বাহির হইল। বঙ্কিম বাবু চুঁচুড়া ছাড়িলেন ; বৌ-বাজারে 'বিড়ালের বিয়ের বাড়ী' ভাড়া লইয়া মাস দুই রহিলেন। তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুর অসুখই তাঁহার চুঁচুড়া ছাড়ার প্রধান কারণ। এই বাড়ীতে ডক্‌টর চন্দ্রার চিকিৎসায় তাঁহার দৌহিত্রটি আরাম হইল। ডাক্তার চন্দ্রা কেবল বলিয়া গেলেন, বালকটির যে পরিমাণ আহারের দরকার, তাহা সে পায় না। তিনি তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন, ঔষধপত্র বড় একটা কিছু দিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রার চিকিৎসার ও চন্দ্রার স্বভাবের বড়ই সুখ্যাতি করিতেন। এখান হইতে তিনি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনে যান। তথা হইতে ৯২ নং বৌ-বাজার ষ্ট্রীটে আসেন। এই সময় "বঙ্গদর্শন" প্রেসও কাঁটালপাড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসে। ৯২ নং বৌবাজার হইতে তিনি ভবানীচরণ দত্তের লেনে যান ; সেখানে থাকিতে থাকিতেই প্রতাপ চাটুর্য্যের লেনে এক বাড়ী খরিদ করিয়া কলিকাতায় কায়েম-মোকাম হন। এই দীর্ঘকাল আমি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম ; বৈকালে অথবা সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম, এবং রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত থাকিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতাম। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যত দিন জীবিত ছিলেন, প্রায়ই ঐখানে আসিতেন, চন্দ্রনাথ বসু আসিতেন, সব্‌জজ বলরাম মল্লিক আসিতেন, বৌবাজারের বলাই দে আসিতেন, সময়ে সময়ে কবি

হেমবাবু আসিতেন, মফঃস্বল হইতে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে আসিতেন—তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক জন। কেহ দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপ আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অনেকেই তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

বঙ্কিমবাবুর নিকট কেহ আসিলে, সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন কথাবার্ত্তা বড় একটা হইত না। লেখাপড়া-জানা লোকের তিনি খুব সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষুতে এক অসাধারণ দীপ্তি ছিল। নাকটি শ্যেনপক্ষীর মত না হইলেও বেশ দীর্ঘ ও সুদৃশ্য ছিল। গাল দু'টি ভারি ভারি ছিল; কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোন হানি হইত না। চেহারাটা মানুষের একটা আকর্ষণ বটে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। সে জয় যে তাঁহার হয় নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কিন্তু সে জয় ত যত দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, যত দিন সে সৌন্দর্য্য লোকে দেখিতে পায়। জয়ের সে কারণ, মরিলেই ফুরাইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জয়লাভের কারণ আরও আছে, সে অন্যরূপ। তিনি সুন্দর জিনিস বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাহাদিগকে সাজাইয়া আরও সুন্দর করিতেন। যেখানে লোকে সৌন্দর্য্য দেখে না, তাহার মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য্য দেখিতে ও দেখাইতে পারিতেন। অসুন্দরকে তিনি একেবারে বর্জ্জন করিতেন। এই মনে কর, কপালকুণ্ডলায় ঐ যে

সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ি আছে—কেবল বালির ঢিবি—বালিতে চারিদিক্ ধূ ধূ করিতেছে—রোদে সেই বালি তাতিয়া পথিককে ঝলসাইয়া দিতেছে—এই ভীষণ বালিয়াড়ি যে সুন্দর হইতে পারে, কে বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতেই কত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, চোক যেন যেথান হইতে ফিরিতে চাহে না।

বঙ্কিমের এক জন ভক্ত ১২৮৫ সালে বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য। নগেন্দ্রনাথই হউন, অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন, বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা—যেন সংখ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্তভাবে বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। বঙ্কিমবাবু স্বভাবের শোভার মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছেন, আর কাছে যে থাকে, তাহাকে দেখাইতেছেন—'দেখ কেমন সুন্দর, দেখ কেমন গম্ভীর। স্বভাবের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে তোমার শরীর পুলকীত হউক'।"

এইরূপ সুন্দর মানুষ লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সুন্দর সমাজ গড়িয়াছেন, সে বিষয়ে ভক্তটি বলিয়াছেন:—

"বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের বিরোধী কোন কাজ করিয়া কেহ কখন সুখী হইতে পারে না এবং করিলেই আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকে অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ-প্রণয়জনিত বিধবা-বিবাহের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার। শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্ব্বতগুহায় প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর

যেরূপ অন্ত হইল, তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।”

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন ঃ—

“বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক—শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক; শিক্ষিত যুবকের জীবন অনন্তবিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়ীতে, এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এই জন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধিভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙ্গালী নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে, তাহারা সকলেই সেই স্বভাবের লোক—বুদ্ধিমান্, চতুর, দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। ঐরূপ লোকের হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইঁহাদের সেই ভাবেই দেখাইয়াছেন।”

বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি হইতে আমরা এখনকার সমাজে কোথায় কি জিনিস সুন্দর আছে, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছি। হীরার ঘরে আলপোনাটি হ’তে আরম্ভ করিয়া নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার পেটিং পর্য্যন্ত সব জায়গায়ই তাঁহার চক্ষু গিয়াছিল, এবং আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, সুন্দর—সুন্দর—সব সুন্দর। বঙ্কিমবাবু সব সুন্দর দেখিয়াছেন, আমরা সব সুন্দর

দেখিয়াছি। কোন্ জিনিসটি সুন্দর—তাহা বিচার করিতে শিখিয়াছি, কোন্ জিনিসটির কতটুকু সুন্দর—তাহারও বিচার করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি? ইহার ফল এই যে, সুন্দর দেখিলেই তাহাতে লোক আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার দিকে একটা প্রবল টান হয়, তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। যদি এই ফল না হয়, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া আর কি হইল? বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য সব ফুটাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেশ ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে ইংরাজীওয়ালারা পড়িতেন সেক্সপীয়ার, পড়িতেন মিল্টন, পড়িতেন বায়রণ, পড়িতেন শেলি; দেখিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য্য, ভালবাসিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য চোখে দেখিতে পাইতেন না, কল্পনায় তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিত। দেশে যে কবিরা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, সে কবিদের তাঁহাদের পছন্দই হইত না। কবিবেচারারা মাঠে মারা যাইত। বঙ্কিমবাবু ইংরাজীওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিলেন। সারথি যেমন লাগাম টানিয়া ঘোড়ার চোখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্য-পথে লইয়া যায়, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিয়া অন্যপথে চালাইয়া দিলেন। সে পথ আর কিছু নয়,—দেশপ্রীতি।

বঙ্কিমবাবু কি প্রথম হইতেই এই মতলবে বই লিখিতে আরম্ভ করেন? না, ইহা তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী চিন্তার ফল? আমার বোধ হয়, অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়া তবে তিনি স্বদেশতত্ত্ব পাইয়া-

ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করিতেন—কিসে পাত্রগুলির চরিত্র ফুটিয়া উঠে, অনেকগুলি পাত্রকে কি ভাবে সাজাইলে নভেলখানি জমে, কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে তাহা লোকের প্রিয় হয়, কোন্ রীতিতে লিখিলে লোকের পড়িতে ভাল লাগে, কোন্ কোন্ জিনিস বর্ণনা করিলে নভেলখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়—প্রথম প্রথম এইগুলিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—কিসে সুন্দর হয়? জমাট—জমাট—জমাট—কিসে জমাট বাঁধে? এই তাঁহার ধ্যান ছিল, এই তাঁহার জ্ঞান ছিল, এই তাঁহার তন্ত্র ছিল, এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। ক্রমে যত বয়স বাড়িতে লাগিল, বুদ্ধি পাকিতে লাগিল, দৃষ্টি দূর হইতে দূরান্তরে যাইতে লাগিল, বিজ্ঞতা ঘোরাল হইয়া আসিতে লাগিল, লোককে শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা তত বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি "বঙ্গদর্শন" বাহির করিলেন। ''বঙ্গদর্শনের" উদ্দেশ্য কি? ''Knowledge filtered down" করিতে হইবে—অর্থাৎ জ্ঞানবিস্তার করিতে হইবে। বঙ্গদর্শন জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যে কি করিয়াছে, তাহা এখানকার লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তখনকার লোকের কাছে "বঙ্গদর্শন" একটি অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে হইত। জ্ঞানপ্রচারের জন্য "বঙ্গদর্শনে"র পূর্ব্বে অনেক মাসিক পত্র, অনেক সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কেহই Knowledge filtered down করিতে পারেন নাই। সরল ভাষায়, সরল রীতিতে দর্শনবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকল সাধারণের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ধরিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনে"র উপকারিতা সম্বন্ধে আমার বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, এখন আবার লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইল, প্রথম পক্ষের স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহার একটি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি শিক্ষা দিবেন কি? তাঁহার ভক্ত বলিয়াছেন—

"রামানন্দ স্বামী যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তিনি তাহার উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। তিনি নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির রামানন্দ স্বামীই বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। এই যে পরহিতব্রত—প্রথম প্রথম "বঙ্গদর্শনে"র নভেলে বঙ্কিম বাবু ইহারই প্রচার করিয়াছিলেন—যথা বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে।"

কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন—পরহিত বা ভূতদয়া বড় ফিকা, জমে না। বুদ্ধদেব ভূতদয়া প্রচার করিয়াছিলেন, বেশী দিন টিকে নাই। ইউরোপে অনেকে পরহিতব্রত প্রচার করিয়াছিলেন, ফল ভাল হয় নাই। তাই তিনি "বঙ্গদর্শন" ছাড়িয়া, যথেষ্ট বহুদর্শিতা লাভ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টি কিছু সঙ্কোচ করিয়া লইলেন—পরহিতের বদলে দেশহিত আশ্রয় করিলেন। এত দিন তিনি দেশের সৌন্দর্য্যমাত্র দেখাইতে-ছিলেন, এখন সেই পুঞ্জীকৃত, রাশীকৃত সৌন্দর্য্যের একমাত্রের আধার বঙ্গদেশকে ভালবাসিতে শিখাইতে লাগিলেন, ভালবাসিতে

উপদেশ দিতে লাগিলেন, জন্মভূমিকে মা বলিতে শিখাইলেন, হিন্দুর যত দেব-দেবী আছেন, সবই এক মায়ের প্রতিমূর্ত্তি—এই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন, একবার প্রাণ ভ'রে বল—'বন্দে মাতরম্।'

ইহার পর বঙ্কিমবাবু যতগুলি নভেল লিখিয়াছেন, দেশভক্তিই তাহাদের মূলমন্ত্র। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রচারও ছিল। কিন্তু সে হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার নিজের মনের মত। তিনি নিজে ভগবদ্‌গীতার টীকা করিয়া সেইমত হিন্দুধর্ম্ম চালাইতে গেলেন। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাধিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, খাওয়ার বাঁধাবাঁধি বা ছোঁয়ার বাঁধাবাধি লইয়া ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম আর এক জিনিস। তাঁহার ধর্ম্ম যে কি ছিল, তাহার কতক আভাস তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে ও অনুশীলনে পাওয়া যায়। একটা পূর্ণ ধর্ম্মের পথ তিনি দেখাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যু অকালে তাঁহাকে গ্রাস করিল। বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন, ইচ্ছায় করুন বা অনিচ্ছায় করুন, জানিয়া করুন বা না জানিয়া করুন—সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্ত, তিনি আমাদের আচার্য্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দে মাতরম্।

যথন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজী হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য্য, পরম সৌন্দর্য্য, অথবা সৌন্দর্য্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম। সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মত হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে over-rule করিলেন। আমিও দেখিলাম, হয় ত দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে বঙ্কিমবাবুর কথাই সত্য হইতে পারে। তিনি আপনার মতেই তিন চারিখানি নভেল লিখিয়া ফেলিলেন। শুদ্ধ সৌন্দর্য্যবাদীরা তাহাতে এক একবার নাক সিটকাইলেও দেশশুদ্ধ লোকেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ও করিবে। তিনি এ বিষয় লইয়া কাহারও সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। আরও অনেক বিষয়ে তিনি বিচার করিতে রাজী হইতেন না। যে দিন তাঁহার দরবারে বসিয়া সর্ব্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিলাম, গানটি কাহারও মনে ধরিল না। এক জন বলিলেন, "অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে"—"শস্যশ্যামলাং শ্রুতিকটু নয় ত কি? দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না।" এক জন বলিলেন—'কে বলে মা তুমি অবলে' "অবলের একার না ব্যাকরণ, না কিছু।" বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি একঘণ্টা ধরিয়া ধীরভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমার ভাল লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছা হয় পড়, না হয়

ফেলে দাও, না হয় প'ড় না।" শ্রুতিকটু দোষ, ব্যাকরণ দোষ থাকিলেও 'বন্দে মাতরম্' সমস্ত ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমেরই জয় হইয়াছে। আমরাও এস, প্রাণ ভরিয়া বলি 'বন্দে মাতরম্ !'

যাঁহারা সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিম চন্দ্রকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায় না, কারণ, তিনি উপদেশ দিতেন না; তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্দ্ধা কেহ রাখিতেন না, অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত, তাঁহার মুখে একটি ভাল কথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভাল বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চ্চা তাঁহার বাটীতে, অন্ততঃ দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চ্চার মধ্যে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান-অপমানের কিছু ছিল না। চব্বিশ বৎসর হইল, তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশকে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সে দেশ এখন স্বদেশপ্রীতিতে মাতিয়া উঠিয়াছে,এবং তাঁহার স্মৃতিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর এই যে গৃহ, যেখানে বসিয়া তাঁহার "বঙ্গদর্শনে"র অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল,যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহুস্বর রোহিণীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশশুদ্ধ উন্মাদ

করিয়াছে, সেই সুরম্য স্মরণীয় গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির কোন চিহ্নই নাই। আমাদের পরম-কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পবিত্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটী আসিয়া বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ বঙ্কিমের বৈঠকখানায় উপস্থিত হন, এবং নিজব্যয়ে এই সুন্দর মার্ব্বেল টেবলেটখানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিকট সকলেই আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি এই কার্য্য করিয়া যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু যে শুদ্ধ যাহারা তাঁহার কাছে থাকিত, তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারিতেন, এমন নয়, যাহারা দেশতঃ ও কালতঃ তাঁহা হইতে অনেক দূরে, তাহাদিগকেও তিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাইলাম। আসুন, আমরা মণ্ডলী হইতে বলি—'পদ্মনাথ বাবুর জয় হউক!'

আর যিনি দেবতার তুল্য স্বামী পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইয়া এই চব্বিশ বৎসর ধরিয়া পরলোকে স্বামীর মঙ্গলের জন্য নানা ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, যিনি এই বৈঠকখানাটি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিয়া স্বামীর এই চিহ্নটী বজায় রাখিলেন, এবং যিনি এইখানে উপস্থিত থাকিয়া আপন সন্তানমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আইস, আমরা সকলে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

বঙ্কিমবাবুর স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকুক, এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর হৃদয় ও মন পবিত্র করিতে থাকুক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ।

১৮৭৯।৮০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথযাত্রা, এবং আমার সহযাত্রী অতুল বাবুতে আর আমাতে ট্রেণ ফেইল্ করিয়া অনেকক্ষণ হাবড়ার ষ্টেশনে বসিয়া ছিলাম। মিষ্টার অতুলকৃষ্ণ রায় তার পর য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন—নানা দেশ দর্শন এবং বিস্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহচর্য্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি সেদিন-কার বর্ষাধৌত প্রভাতটীকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-গর্ব্বের একটা আনন্দহিল্লোল আমার শরীর মন অভিষিক্ত করিতেছিল।

চুঁচুড়ার যোড়াঘাটে আমাদের গাড়ী যখন পঁহুছিল, বঙ্কিমবাবু তখন আফিসের পোষাক আঁটিয়া বাহির হইয়াছেন—এগারটা বাজিতে বেশী দেরী নাই। বলিলেন, চিঠি পাইয়া প্রাতঃকালে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যা হোক, অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে কথাবার্ত্তা হইবে। সেই প্রথমদর্শনে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, আর কখনও সেরূপ দেখিয়াছি, মনে হয় না।

প্রায় তিনটার সময় আবার দেখা হইল। ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলার সাজসজ্জা এবং কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নল দেখিয়া আমার "বিষবৃক্ষে"র হুঁকার স্তব মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার সারাংশমাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন,"এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরেজী ভাষাটা ভারি Insincere বলিয়া আমার মনে হয়।" আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, " 'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটী প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।" প্রবন্ধটীতে আমি বলিয়াছিলাম,—'ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।' কথা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, এখনকার ছেলেরা দেখিতে পাই গুরুজনদিগকে আগেকার মত প্রণাম করে না। নিজের বাড়ীর রথ দেখিবার জন্য তাঁহার অপরাহ্নে কাঁঠালপাড়ায় যাওয়ার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিমবাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম, নব্য যুবকদের প্রতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। জামাতা রাখালবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীশ বাবুকে আর বেহাইকে জল খাওয়াও।" এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পঁহুছিলেন—বঙ্কিমবাবুর কাঁঠালপাড়া যাওয়া হইল না।

ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু কথায় কথায় বলিলেন, "কই, চন্দ্র, তুমি বাঙ্গালা লেখা ছাড়িলে, বাঙ্গালা যে আর পড়িতে ইচ্ছা করে না।" "রাজসিংহ" তাহার কিছু দিন আগে "বঙ্গদর্শনে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁর কোনও বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, "এঁরা বলেন—আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলে পুলে মাটী হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।" বলিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ, তাহা আমি স্বীকার করি।" চন্দ্রশেখর বাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত দুই একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে "রাজসিংহে"র প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। আর একদিন চন্দ্রশেখর বাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওঁকে চেন না?—উদ্ভ্রান্তপ্রেম।" মনে হইতেছে, এই দিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর

হইতে বঙ্কিমবাবুর একটী প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে মিলনের আনন্দ এবং হাস্য এখনও আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পড় ?"

উ—Fourth year, Presidency College.

বঙ্কিমবাবু—রাখালের সঙ্গে আলাপ নেই ?

উ—না।

বঙ্কিমবাবু—সে কি হে—এক ক্লাসে পড়, আলাপ নেই ?

সঞ্জীববাবু বলিলেন, "তা জান না বুঝি ? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটা ঘোর বেয়াদবী! ওর একটা গল্প আছে। এক নব্য শিক্ষিতের সঙ্গে একজন সেকেলে লোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, তাঁর নামটী কি ? নব্য বাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি, আবার প্রশ্ন, 'মহাশয়ের পিতার নাম ?' বাবুটী চটে লাল, বুড়োকে মারেন আর কি! ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া বাড়ীর অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটীকে সুধাইল, 'বাবু, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগ কেন ?' ভারি হাসি পড়িয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় "আনন্দমঠের" সুপরিচিত "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটীর একাংশ আবৃত্তি করিয়া

বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, "এমন ভাল জিনিসটাকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে। এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিম বাবু ঈষৎ কুপিত-স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে, পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ও রকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব!"

কিছু দিন আমি রীতিমত ডায়েরী রাখিতাম। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখা শুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরু শিষ্যের যে সম্বন্ধ, এক দিকে গাঢ় স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। অতএব বিস্তর কথা আমি আদৌ স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বলিতে পারিব।

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী "আর্য্যদর্শন" পত্রে "শৈবলিনী" চরিত্রের সমালোচনা করেন। সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র চলিয়াছিল। লোকনাথ বাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, দুর্গেশনন্দিনীর অভিনব সংস্করণে দিগ্‌গজকে নূতন রূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিম বাবু উত্তর দেন যে, এক শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্ম তাঁহাকে সে চরিত্রের কোনও কোনও স্থল নূতন করিতে হইয়াছে।

প্রতাপ যেখানে বলিতেছেন যে, “তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।” সেই স্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, প্রতাপের অসাধারণ বলবান চরিত্রে সেরূপ ভাব কেন? বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছিলেন যে, প্রতাপ বস্তুতঃ অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাঁহার মহত্ত্ব, এবং তাহাই প্রকৃতিসঙ্গত।

সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে একদিন আমার গ্রীক্ লাওকোয়নের কথা হইতেছিল। তিনি বুঝাইতেছিলেন, গ্রীক শিল্পী সেই প্রস্তর-মূর্ত্তিতে কি সুন্দর কাব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলদৃপ্ত লাওকোয়েন সর্পবেষ্টিত এবং আসন্নমৃত্যু হইয়াও বামে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র দুটিকে যত্নে রক্ষা করিতেছেন, সেই অবস্থায় দৃঢ় ওষ্ঠে অধর চাপিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বিধাতা দেবতাদের জানাইতেছেন, অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় জানিয়াও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সঞ্জীব বাবু বলিলেন, এইখানে শারীরিক বলে ধর্ম্মবল মিশিয়াছে, এবং মাঝে একদিন বঙ্কিমবাবু কুমারসম্ভব হইতে হিমালয়-বর্ণনা পড়িতে পড়িতে প্রতিশ্লোকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, কোনও কবিতাতেই কেবল প্রকৃতি বর্ণিত হয় নাই—সর্ব্বত্র অন্তঃসৌন্দর্য্য নিহিত আছে। শুনিলাম, সে দিন প্রায় রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে কাব্যালোচনা করিয়াছিলেন। আমার সমক্ষে সেই রাত্রের কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবুর এক জন বন্ধু বলিলেন, “তোমার সেদিনকার কথা মত বোধ হয়—কিছু লিখিবে, কিন্তু তাহার ভাষা তত ভাল নহে।” আমি বঙ্কিমবাবুকে

বলিলাম, "আপনিই কেন লিখুন না ?" বঙ্কিম বাবু উত্তর দিলেন, "আমি বুড়া হলাম, আর পারিনে, এখন তোমরা লেখ।"

১৮৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়া আমি কলিকাতায় আসি। আমার গৃহিণী এক অদ্ভুত রকমের হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন, উহা Clairvoyance। এই রোগ ডাক্তার সরকার অতি আশ্চর্য্য-রূপে আরোগ্য করেন। আমার ডায়েরীগুলি যদি কখনও ছাপা হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হইবে। এখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্কিমবাবু তদুপলক্ষে নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

২১শে ফাল্গুন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। আমার সহধর্ম্মিণীর অসুখের কথা এবং তাঁহাতে কতকগুলি শক্তি বিকশিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, "রোগ মারাত্মক নয়। একটা কথা যেন মনে রাখা হয়। রোগিণীকে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে, হিষ্টিরিয়া দৌর্ব্বল্যেই হয়।" কথায় কথায় আমি তাঁহার নবেলসমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন, "সব নবেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না।" আমি বলিলাম, "আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে, শৈশবাবধি তার দরুণ মনে একটা Impression আছে।" বঙ্কিমবাবু—"সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে, আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।" আমি বলিলাম, "বইএর অনুরূপ

কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ কখনও দেখেছেন কি না?” একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, “না।” তার পর সিনেট সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে, মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। Theosophy এদেশে আসিবার পূর্ব্বে আমি তা লিখেছি।” পৌষ-সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে” “দেবী চৌধুরাণী” কার লেখা জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, উহার “Mysteirous author-ship”। আমি বলিলাম, তাঁর লেখা বলিয়াই আমার বোধ হয়েছে। উত্তর—“অনেকে তা বলেন না।”

একদিন বঙ্কিম বাবুর বাড়ী গিয়া দেখি, তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথ বাবু এবং সঞ্জীব বাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইঁহাদের ভারি একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয়—Universityতে মেয়েদের বি, এ, উপাধি-লাভ উপলক্ষে হেমবাবুর অভিনন্দন-কবিতাটী। হেমবাবু ইংরেজীতে বলিতেছিলেন, “তোমাদের কোনও উৎসাহ নাই, জীবন নাই।” সঞ্জীব বাবু বলিলেন, “ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তুমি সকলের ছোট।” তখন হেমবাবু সঞ্জীব বাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, দুজনে একটু রহস্য চলিল। পরে হেমবাবু বঙ্কিমবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “Sentiment governs the world, not logic.” বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “তা ত বটেই।” পরে অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

২৬শে চৈত্র সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎকালে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “রবীন্দ্র কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার পরিবারের সংবাদ পাই। নূতন বাসায় বাতাসের সুবিধা কেমন? আমি নিজে গিয়া

দেখিয়া আসিব। ছাদে রোগিণীকে শয়ন করানর ব্যবস্থা করা যায় কি না? আমার মধ্যমা কন্যাটী সেবার হিষ্টিরিয়াতে দুই মাস কষ্ট পায়। যে ঘরে তাকে রাখা হয়, দিন রাত্রি তা খোলা থাকৃত, এত বাতাস যে, সহজ লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব। মাঠের ভিতর ঘর। যা তা খাওয়াইতাম, দু'মাসেই সারিয়া গেল।" সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অলকট্ সাহেব আসিয়া কি করিল?" আমি তাঁহার ও মিসেস্ গর্ডনের কার্য্য বর্ণনা করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় mesmerize করিতে জানেন। সে দিন তিনি (বঙ্কিম বাবু) ডাক্তারী কোনও পুস্তকে পড়িতেছিলেন,ফোড়ার উপর mesmerize করার মত অঙ্গুলি চালনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয়, তবে আঙ্গুলে কর্পূর মাখাইতে হয়।" সঞ্জীব বাবু বলিলেন, তাঁর নিজেরও কিছু কিছু mesmeric power আছে; তিনি উহার দ্বারা নিজের স্ত্রীর ফোড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ফোড়া স্পর্শ করিতে হয় নাই। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শ্রীশবাবু, সকলই ত দেখিলে। আমার একটা কথা শুনে কাজ ক'রে দেখ দেখি। কাল প্রাতে স্নান করে' ফল মূল খাইও, আর কিছু খেও না। সমস্ত দিন একমনে চিন্তা করো, কিসে তোমার পরিবারের পীড়া ভাল হবে। মন ও শরীর পবিত্র রেখো, মনে পাপ-চিন্তামাত্র স্পর্শ না হয়। সন্ধ্যার সময় একবার তাঁর শয্যাপার্শ্বে ব'সে তাঁকে স্পর্শ করিও। ইহাতে বেশ বিশ্বাস করে' কাজ করো, নহিলে করো না।" আমি সম্মত হইয়া আসিলাম।

২রা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম।

তখন তিনি বৈঠকখানার বাহিরে অনাবৃতশরীরে ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিন বাবু এবং একটী দৌহিত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর রং যে তত ফর্সা, মুখ দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার পরিবারের পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতেছে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "সোমবারে মেজদাদা (সঞ্জীববাবু) ফিরিলে একত্রে দেখিয়া আসিব।" সঞ্জীব বাবু মিছমারাইজ্ করিতে জানেন। বঙ্কিমবাবু নিজের তৃতীয়া কন্যার পীড়ার গল্প করিলেন। পনের দিন তাঁর দাঁত খোলে নাই। ডাক্তার কেলি নাসিকা দ্বারা আহার করাইতেন। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতা হইতে হাবড়ার বাসায় লইয়া যাওয়া ভারি কষ্টকর হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ভৌতিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হিষ্টিরিয়া বলিয়াছিল। বলিলেন, "তাহাদের ঝাড়া ঝোড়াও mesmerism, জলপড়া mesmerized water, এই সকল উপায়ে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাও। আমার কন্যাকেও mesmerize করার উদ্যোগ হইয়াছিল। যদি কাহাকেও না বল, একটী পরামর্শ দিই। তারকেশ্বরের মানত করিও, তাহাতেও উপকার হয়। আর কার্ কথা বলিব? জজ্ ব্রজেন্দ্রলাল শীল ঐ রকমে সারিয়া গিয়াছেন। অনেকেই Sceptic, তাই এ সব কথা সকলকে বলি না। কিন্তু অনেক সত্য এতে আছে। তোমার বিশ্বাসের জন্য আরও দু'একটা গল্প বলি। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই শ্যামাচরণ বাবুর কন্যাটীর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তার শ্বাস-কাস ও জ্বর হয়। কিছুতে ভাল হয় না দেখিয়া শ্যামাচরণ বাবুর স্ত্রী মেয়েটীকে লইয়া কলি-

কাতায় আসেন। আমি তখন এখানে সপরিবারে থাকি। মহেন্দ্র বাবু তখন এলোপেথি হোমিওপেথি দুই মতেই চিকিৎসা করেন, এত নাম হয় নাই। তিনি ও আর আর ডাক্তারেরা বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন, ঘরে বাতাস মাত্র আসিতে দিতেন না। একটু সাগু মাত্র খাইতে দিতেন, তাও হজম হইত না। প্রাতে আসিয়া মল পরীক্ষা করিয়া প্রত্যহ মহেন্দ্র বাবু সন্দেহ করিতেন যে, সাগুর চেয়ে আরও কিছু বেশী খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতে কিছু হলো না—মেয়েটী বাঁচে না। নিজে গিয়া আমি তাকে বাড়ী রাখিয়া আসি—রেলের কষ্ট তার সহে কি না, মহেন্দ্র বাবু সন্দেহ করিয়াছিলেন। তার পর বাড়ী গেলে এক মাগী কর্ত্তাভজা আসিয়া মেয়েটীকে দেখে বলিয়াছিল যে, সেটী কেন তাকে দেওয়া হোক্' না। তাঁরা ত তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। সে যদি কোন উপায়ে মেয়েটীকে বাঁচাতে পারে, তবে মেয়ে তাহারই হবে। শেষে মেয়েটীর চিকিৎসা করিতে সম্মত হয়ে বলে যে, সে যা বলিবে, তাহাই করিতে হবে। প্রথমে মেয়েটীর গলায় একটা কিসের পুঁটুলী বাঁধিয়া দিয়া তাকে পুকুরে স্নান করাইতে বলে। তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, আবার সেই জলে মেয়েটীকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন থেকে উপকার বোধ হতে লাগ্‌ল। মেয়েটী ক্রমে বেঁচে উঠল। এখন সে বেঁচে আছে। বয়স বিশ বৎসর।"

আমি বলিলাম, এ সকল ব্যাপারে আমার বড় বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁর "রজনী"র সন্ন্যাসী চরিত্র এবং লর্ড লিটনের একখানি নভেল পড়িয়া বোধ হইয়াছে যে, তাহা অসম্ভব নহে। বঙ্কিম বাবু হাসিলেন,

বলিলেন, "অনেক দেখিয়া তবে তিনি লিখিয়াছেন।" "বঙ্গদর্শনে"র কথা একটু হইল। "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মত ও প্রশংসার কথা বলিলাম। উহার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "গিয়াছিলাম, কিন্তু অভিনয় ভাল হয়নি। তাই ডাক্তার সরকারকে লইয়া যাইনি, নইলে সরকার যাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" বঙ্কিম বাবু দেশীয় থিয়েটারের উপর বড় চটিয়াছিলেন, বলিলেন, এখন উহা ভদ্রলোকের যাইবার যোগ্য স্থান নহে। কতকগুলো অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হ্যা হ্যা করিয়া হাসে—বড় ত্যক্ত হইয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, থিয়েটারের উন্নতির জন্য তিনি ম্যানেজারদিগকে উপদেশ পরামর্শ দেন কি না? বলিলেন, "বেশী নহে, তা বুঝিবে কে?"

এই সময়ে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করিতে আসেন। তিনি উঠিয়া গেলে রাখালকে বলেন, "ইনি নিশিকান্ত, বড় বিদ্বান।" একটু পরে হাসিয়া বলেন, "আমি ত মন্দ বল্‌তে পারবই না, তিনি য়ুরোপে বসিয়া আমার বই পড়িয়াছেন।"

মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একটু অবনিবনাও হওয়ায় এই সময়ে বঙ্কিম বাবুকে হাবড়ায় পৃথক বাসা করিতে হইয়াছিল—মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসেন। আমি আসিয়া দেখি, ইজিচেয়ারে বসিয়া তিনি তন্ময়-চিত্তে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মত এই যে, মস্তিষ্কের পোষণ জন্য প্রচুর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন।

বলিলেন, তাঁর শরীরে এমন বল নাই যে দশ সের জিনিস তুলিতে পারেন, অথচ অতিশয় অধিক আহার করিয়া থাকেন। হুগলীতে অবস্থানকালে বাবু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির সঙ্গে দুইদিন কিরূপ ভায়ানক আহার করিয়াছিলেন, সে গল্প করিলেন। আপাততঃ তত বেশী খাইতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু যাজপুরে থাকিতে তিনি দুই বেলায় চারটে মুরগী, আটটা ডিম ও আর আর জিনিস প্রত্যহ খাইতেন। চারটে মুরগীর কথা শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলে বলিলেন, "তাহা এখনও পারি।" বলিলেন, "মানসিক শ্রমটা বড় করিতে হয়, এত না খেলে চলে না।" জিজ্ঞাসা করিলাম "যৌবনাবস্থায় কি এমন আহার করিতে পারিতেন?" উ—"না, এখন পারি।" কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশী দিন টেঁকিবে? উত্তর—"বলা বড় শক্ত, বোধ হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।" প্রশ্ন—"বিষবৃক্ষ কত দিনের লেখা?" উত্তর—"১৮৭২ সালের। যাজপুরে 'দেবী চৌধুরাণী' লিখেছি।" প্রশ্ন—"তা কি শেষ হয়েছে?" উত্তর—"না এখনও হয় নাই।" প্রশ্ন—"আচ্ছা আপনি ত অনেক চরিত্র লিখেছেন, দীনবন্ধু বাবুর নিজের চিত্রিত চরিত্রগুলির অধিকাংশ জীবিত বা মৃত—আপনিই লিখেছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি তেমন?" উত্তর—"সেই রকম বটে, কিন্তু তার উপর অবশ্য রং ফলান।"

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি একদিনকার কথা। শনিবার, প্রায় পাঁচটার সময় বঙ্কিম বাবুর কলুটোলার বাসায় গেলাম। রাখালের

কাছে শুনিলাম, "মৃণালিনী" সপ্তম সংস্করণে অনেকটা বদল হইয়াছে। দুই জনে পুরাণ ও নূতন পুস্তক লইয়া মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, পুরাণ পুস্তকের দুই অধ্যায় একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কয়টীমাত্র কথায় দুই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র-পরিহারের চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি রাখালকে বলিলাম, বইটে নাটক ও ভাষাংশে আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু একাংশে সাধারণের বোধ হয় কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সেক্ষপীয়র প্রভৃতির নাটক লেখার সাময়িক পর্য্যায় ঠিক্ করিয়া আধুনিক সমালোচকগণ তাঁহাদের মানসিক ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে পরবর্ত্তী লেখকদের সে সুবিধা ঘটিবে না। একটু পরে বঙ্কিমবাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। আমাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্চে?" এবং আমার প্রশ্নমত বলিলেন, মৃণালিনীর অনেক বদলাইয়া দিয়াছেন। তখন আমরা উভয়ে "ষ্টেটস্ম্যান" হইতে বারাকপুরে সুরেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহেবদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারের বৃত্তান্ত পাড়িতেছিলাম। বঙ্কিম বাবু হাসিয়া সুধাইলেন—"বারাকপুরের লড়াই পড়ছ না কি?"

আজ নিতান্তই সামান্য কারণে তাঁহাকে অতিশয় রাগিতে দেখিলাম। শুনিলাম, আগে এমন ছিল না। মালদহে থাকিতে মাথার ব্যারাম হয়, সেই হইতে রাগ হইয়াছে, ইহা আর সুধরাইল না। মালদহে মাথার পীড়ার ইতিহাস এইরূপ:—যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানে নাকি পূর্ব্বে নরবলি হইত। পরিবার সঙ্গে ছিল না। একদিন এক কুঠরীতে বসিয়া আছেন, কে আসিয়া ভয়ানক

বেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। "কেরে? কেরে?" করিয়া বঙ্কিম বাবু চীৎকার করিলেন। উত্তর নাই। চাকরেরা আসিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সেই হইতে মস্তিষ্কের পীড়ার সূত্র। পরদিন কাছারীতে লিখিতে লিখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

"প্রতিনিধি" নামক সংবাদপত্রে আমি "কুন্দনন্দিনী" চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য চরিত্র, তার অত বিশ্লেষণের দরকার ছিল না। আমি বলিলাম, "এক বিষয়ে চরিত্রটী আমার কাছে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়—উহার নিশ্চেষ্ট সরলতা। কোথাও আর অমন চিত্র দেখি নাই।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি তিলোত্তমার চরিত্রেও একটু তাহা দেখাইয়াছি।" আমি বলিলাম, "কুন্দে তাহার বিকাশ অনেক বেশী।" আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্য-সৃষ্টির শক্তি এখন বাড়িতেছে।" বঙ্কিমবাবু—"হাঁ, দেখিয়াছি, সে কথা সে দিন তুমি কুন্দচরিত্রের শেষে লিখিয়াছ। চন্দ্রবাবুও তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধ হয়। মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক। থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দ্দশা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।" আমি বলিলাম, "এইবার কেন একবার নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন না?" উত্তর—"লিখিব কার জন্য? তেমন শ্রোতা নাই, অভিনেতা নাই, তার পর নাটকের ভাষা এখনও হয় নাই।" বলিলাম, "আপনার কাজ আপনি করিয়া যান, পরে লোকে বুঝিবে।" সম্মত হইলেন, নাটক লিখিতে চেষ্টা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম

—"আপনার ইতিহাস লেখার কি হইল ?" উত্তর—"এখন ওসব হয় না। যদি কখনও চাকরী ছাড়িয়া কোন লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়িতে পাই, তবে লিখিব। এখন কিছু হয় না। তোমরা ত পাঠক বাড়াইতেছ, তখন একবার দেখা যাবে।" কথা উঠিল, আজকাল লোকের হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থা বাড়িতেছে, সে সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "সেবারে আপনি মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু কাজ হইয়া থাকিবে।" বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, তাঁর আনন্দমঠ এবং হেষ্টির সঙ্গে তর্কবিতর্কের পত্রগুলি কতক কাজ করিয়া থাকিবে। তার পর তাঁর ইংরেজী লেখার কথা হইল। বলিলেন, বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।

আমার "বঙ্গদর্শন"-গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, "শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটী কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, তা হবে না।" আমি বলিলাম, "বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে ? নবেল বরাবর ত চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে।" উত্তর—"নবেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব ন'মাসে ছ'মাসে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবা পুরুষ, অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজ দাদাও খান।……সেবারে

দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।......" আমি বলিলাম, "আপনি কেন সম্পাদক হোন না ?" উত্তর—"আর আমার সে উৎসাহ নাই।"......আর একদিন চন্দ্রনাথবাবু "বঙ্গদর্শনে"র কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, "শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।" বঙ্কিমবাবু অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "তা' হলে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়িব কেন ? তা হলে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না। শ্রীশবাবুকে সন্ধ্যার পর এসে গণেশ হইতে হইত।".....একটু পরে খিদিরপুর হইতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উকীল উমাকালী বাবু আসিলেন। খাজনার আইন বিলের আন্দোলন জন্য ইংলণ্ডে লর্ড লিটনকে মুরুব্বী খাড়া করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমবাবু যোগেন্দ্রবাবুকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবুকে পান লইয়া খাইতে দেখিয়া বঙ্কিম বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এখন পানে দিলে মন !" খুব হাসি চলিতেছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু আমারই মত শ্রোতা—বড় কিছু বলিতেছিলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,'সুন্দর অর্থে ভাল নহে' ; ইহা কি ঠিক্ ?" চন্দ্রবাবু স্বীকার করেন না। উত্তর—"কোথায় লিখিয়াছি ?" আমি—"বৃত্রসংহারের সমালোচনায়।" উত্তর—"ভুল লিখিয়াছি।" আমি কার্লাইলের কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তাঁরও সেই মত—Beautiful includes good."

আমি বলিলাম, "আমার ইচ্ছা, আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক

কতক নোট্ এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি ?" বঙ্কিম বাবু হাসিলেন, বলিলেন, "আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে ? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নহে ! জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন, আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে, কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতি গতি অতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলে বেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকৃতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি ; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি,

বলা যায় না।" বঙ্কিমবাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম, "শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা ?" উত্তর—"কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে।" একটু পরে বলিলেন, "চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ, আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ-স্বরূপা।" আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, "স্ত্রীচরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশী। পুরুষও কয়টী অতি সুন্দর আছে।" অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিম বাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, "অমরনাথ আর প্রতাপ একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ।" বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী ; কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।" বলিলেন, "পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন।" স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, "কৃষ্ণকান্তের উইল" তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, "অনেকে কপালকুণ্ডলাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে।" উত্তর—"হাঁ, কাব্যাংশে খুব উচুঁ বটে।" তার পর নিজেই বলিলেন, "প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে 'আইভানহো' পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্ষপীয়র বড় বেশা পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।" চন্দ্রশেখরের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, "ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোনও কাব্যে দেখা যায় না।

সেই 'অগাধজলে সাঁতারে'র মত সুন্দর অপূর্ব্ব দৃশ্য বড় দুর্ল্লভ!" আমার কথা স্বীকার করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "অগাধজলে সাঁতারে'র মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" নিজের জীবনী সম্বন্ধে বলিলেন, "অন্যায় কাজের মধ্যে মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, সে জন্য কখনও কোনও দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বসিলে একটু অপব্যবহার না হয়, এমন নহে।" প্রশ্ন—"মদে আপনার শারীরিক কোনও অসুখ হয় না?" উত্তর—"না, বরং মদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হোক, আমাদের মতন লোকের নিকট হইতে এটা বড় কুদৃষ্টান্তের কাজ করে। সেবার ডাক্তার গুরুদাস যখন বহরমপুরে ছিলেন, কতকগুলি কলেজের ছাত্রকে মদ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, 'দোষ কি মহাশয়? অন্যায় কাজ হলে বঙ্কিমবাবু করিবেন কেন?' গুরুদাস বাবু আমার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি যেন ওটা ত্যাগ করি। দুই একবার ত্যাগও করিয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?" উত্তর—"পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী 'গিফ্‌টেড্‌', কিন্তু 'প্রিকোসাস্‌', এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সে দিন রবিকে বলেছি। রবি বলেন, আপনিও ত অল্প বয়সে 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখেন। আমি যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখি, তখন

আমার বয়স ২৪ বৎসর।" * * আমি বলিলাম, "এই বয়সে দুইবার ইয়ুরোপ-ভ্রমণে যাওয়াও আমার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ সুবিধা।" উত্তর—"তাতে উপকার হয়েছে কি না, জানি না। আমার ইচ্ছা আছে, পেন্‌সন লইয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া একবার ইউরোপ যাব।" * * নিজের সৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে আবার বলিলেন, "এ দেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক 'আনন্দ-মঠে'ই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হলে আর রক্ষা থাকৃবে না।" ইডেন সাহেবের কথা উঠিল। বলিলেন, "লোকটা যেমনই হোক্, খুব বুদ্ধিমান। আমায় একদিন বলিয়াছিল, 'আপনার বই খুব পপুল্যার, অনেক বোধ হয় বিক্রয় হয়।' আমি উত্তর করি, 'আমাদের দেশ বড় গরিব, বেশী বিক্রী হয় না।' ইডেন সাহেব—'২৲।৩৲ টাকায় এক কাপি বিক্রয় করিতে পারেন না?' তখন আমার কাছে শুনিলেন যে, এক টাকা দামেও লোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না। ইডেন সাহেব আর কিছু দিন এখানে থাকিলে আমার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল হতো।" অন্যান্য সাহেবদের কথা হইল। অনেকে বঙ্কিম বাবুকে বলে, এ দেশে এই লোকটাই অদ্ভুত শক্তিশালী। কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম, রিয়াক্ সাহেব হোমিও-

প্যাথ লোকনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্যই কি হেষ্টির বিরুদ্ধে পত্রগুলা বঙ্কিম বাবুর নিজের লেখা ?

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।" নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্য'টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না। প্রবন্ধ-পুস্তকেও অনেক ভুল, সেটাও ছাপাব না। তবে ভিন্ন পুস্তকাকারে উহার কয়টা প্রবন্ধ দিব।"

পূজার সময় নবমীর দিন কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা আহার করিতে বসিলে বঙ্কিম বাবু লেবু পরিবেশন করিলেন। নীচে কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছিল, হাসিয়া বলিলেন, "দেখ চন্দ্র, নানা রকম রূপ, দেখিলে আর খেতে পার্‌বে না।" বঙ্কিমবাবুর প্রথম যৌবন-কালের একখানি ছোট ফটোগ্রাফ্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যতীশচন্দ্র আমায় দেখাইলেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন "এখানি 'দুর্গেশ-নন্দিনী' লিখিবার আগের ছবি।" বঙ্কিম বাবুদের বংশ বৈষ্ণব, পূজায় আমিষের সম্বন্ধ নাই। এক মেছুনী মাছ লইয়া দরওয়াজায় ঢুকিল, বঙ্কিম বাবু সে দিকে আসিতেছিলেন, একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মাছ নাবাস্‌নে, আজ মাছ আন্‌তে নেই।" যতীশ বলিল, "যা কথনও হয়নি, তাই কর্‌লি ?"

বাহিরের বৈঠকখানায় টেবিলের উপর বঙ্কিমবাবুর আর এক-

খানি বড় ফটো দেখিলাম। খুব অল্প বয়সের ছবি, রবি-বাবুর প্রথম বয়সের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের মত চুল, মুখের চেহারাও অনেকটা সেইরূপ,—এখন কিছু মেলে না। চন্দ্র বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনকার চেহারার সঙ্গে কিছু কি মেলে? আচ্ছা বল ত, এখনকার চেহারা ভাল, কি তখনকার?" আমি তখনকারটাকেই পছন্দ করিলাম। চন্দ্রনাথ বাবু হাসিয়া আমার মতে মত দিলেন। বঙ্কিম বাবুও হাসিলেন, বলিলেন, "ও কথা মেজ বাবু স্বীকার করেন না, বলিলে মারিতে আসেন!"

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, "সাধনা"য় "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ"* লিখিয়াছিলাম। তখন ইচ্ছা ছিল, আরও কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আমার সংগ্রহ এবং জানা আছে, সাধারণে প্রকাশ করিয়া তদীয় ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখকের পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিয়া দিব। নানা কারণে এতদিন সে মহৎ সঙ্কল্পের অনুসরণ করিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়টীমাত্র কথা বলিবার অবসর পাইব। ১৮৮৫ অব্দের পূজার পূর্ব্বে "প্রচার" পত্রে "কৃষ্ণ-চরিত্রে"র যে অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষ ভাবে তাঁহার রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল; পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত, যুদ্ধে প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারী অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিংসাবৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক, অথচ হিংসার মত সমাজবিরোধী (Antisocial) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শচরিত্র হইয়া

* সাধনা; শ্রাবণ-সংখ্যা; ১৮৯৪।

তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সে সময়ে রবীন্দ্র বাবু ও আমার সম্পাদিত "পদরত্নাবলী" মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং আমি উহার একখণ্ড বঙ্কিম বাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। কিছুদিন পরে নদীয়া জেলায় প্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাই। পলাশীর অদূরে কালী গ্রামে অবস্থানকালে বঙ্কিম বাবুর পত্রোত্তর আমার হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা—কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"প্রিয়তমেষু—

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি, শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

'পদরত্নাবলী' পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের, না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না, এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব। কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও

প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটী তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।—

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। (যথা William the Silent)। ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কথন প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কথন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র।

ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য-চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

এইখানে একটী কথা মনে পড়িতেছে। "পদরত্নাবলী"র ভূমিকা লেখা শেষ হইলে একদিন প্রাতে বঙ্কিম বাবুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তাহার শেষ দিকে এক স্থানে আছে:— "যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বাৎসল্য ভাব, ব্রজ-রাখালের সেই ঢল-ঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ, যার বলে—

'দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।'

সৌন্দর্য্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার নীচের এই সব পরদা তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন।” “চল-চল বালসুলভ সখ্যে”র স্থলে আমি লিখিয়াছিলাম “চল-চল ছেলেমি সখ্য।” শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “দেখতে পাই, রবীন্দ্রের ও তোমার লক্ষ্য বাঙ্গালায় সংস্কৃতমাত্র বর্জ্জন ক'রে কেবল চল্‌তি কথা চালান।” তাঁহার সঙ্গে কথন তর্ক করিতে পারিতাম না, অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে বলিলাম, “কি কর্‌তে হবে?” বঙ্কিমবাবু—‘ছেলেমি’র জায়গায় ‘বালসুলভ’ কর।” বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য কতটা ঠিক, তাহা তখনকার “বালক” পত্রের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই চৌদ্দ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা-বলে নূতন পথ খনন করিয়া পদ্য ও গদ্যের ভাষায় অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার ও ওজস্বিতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আমি কিন্তু আজিও সোজা সরল ভাষার মোহ সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। সরস্বতী-পূজার দিন কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন কলুটোলায় সেন মহাশয়দের বাড়ীর কাছে তাঁহার বাসা। উপরের বৈঠকখানায় পীড়িত শ্যামাচরণ বাবু শয্যাগত, নীচে রাখালের ঘরে একপার্শ্বে সঞ্জীববাবু ও রুগ্নশয্যার কাছে বঙ্কিম বাবু।

রাজকুমারবাবু এবং ঔপন্যাসিক দামোদর বাবু বসিয়াছিলেন। শেষোক্ত কিছুদিন পূর্ব্বে শ্যামাচরণবাবুর বৈবাহিক হইয়াছিলেন; অতএব উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া নূতন বৈবাহিকের সঙ্গে রহস্যে রহস্যে আমাদিগকেও আমোদিত করিতেছিলেন। সঞ্জীববাবুর

তামাসার মাত্রা কিছু বেশী বেশী, বঙ্কিমবাবুর ততটা নহে, তিনি বরঞ্চ বার বার বলিতে লাগিলেন—"ছেলেমানুষের সঙ্গে ওসব কেন? রাখালের বয়সী বা কিছু বড় বই ত নয়।" কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তবু ছাড়েন না। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"বিধাতা কেন যে আমায় দুজনার ছোট করেছিলেন, জানিনে।"

দামোদরবাবু উঠিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমায় সুধাইলেন, "তুমি পলাশীতে কি কি পেয়েছিলে, আমায় লিখেছিলে?" আমি যুদ্ধক্ষেত্র ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে গোলা ও গুলি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম—লাক্ষাবাগের অবশিষ্ট একমাত্র আম গাছের ছোট একখণ্ড কাষ্ঠও পাইয়াছিলাম। তাহার পরিচয় দিয়া বলিলাম, "দেখবেন?" বঙ্কিমবাবু—"দেখে আর করব কি? কেবল কাঁদা বই ত নয়।" কথায় কথায় আমি বলিলাম, "কীর্ত্তন সম্বন্ধে এবার কতক অনুসন্ধান করে এসেছি।" বঙ্কিমবাবু—"ও সবে কিছু হবে না। এখন ভবিষ্যতের একটা ভিত্তি কর্‌তে হবে।" আমি—"সে আপনি করুন, আমাদের সাধ্য কি?" বঙ্কিমবাবু—"সেই চেষ্টাই ত করছি। কেমন, শ্রীকৃষ্ণের উপর ভক্তি কিছু হল?" আমি স্বীকার করিলাম, এবং বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ যে কাব্যের সৃষ্টি বলিয়া আমার ধারণা হইতেছিল, তাহা বলিলাম। তিনি এ কথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "গীতায় এক জায়গায় মাত্র দেখি রাসাধ্যায়ে গোপীরমণ। রাসের অর্থ আমি এই রকম বুঝি, তখন স্ত্রীজাতির বেদাদিতে অধিকার ছিল না, অথচ তাহাদের শিক্ষা চাই; শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, কলা বিদ্যার দ্বারা তাহাদিগকে

শিক্ষা দিবেন। ইহার বেশী আর কিছু নয়।" ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু বোধ হয় কৃষ্ণচরিত্রের পরবর্ত্তী সংস্করণে এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বসম্পর্কীয় স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এরূপ সৌহার্দ্দ্য যে, বঙ্কিমের মাতৃবিয়োগের পর তিনিও তাঁহাদের বাড়ী গিয়া কাচা পরিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু আমায় একবার বলিয়াছিলেন, জগদীশ বাবু তাঁর চেয়ে অন্ততঃ পনর বছরের বড়। অথচ সমবয়স্কের মত তাঁহাদের বন্ধুতা ছিল। সাহিত্যানুরাগী পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না, বঙ্কিমবাবু ইঁহারই নামে "বিষবৃক্ষ" উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৮৯১ অব্দের শরৎকালে সীতামাঢ়ি হইতে কাঁথি বদলী হইবার সময় বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখিতে যাই। অল্পদিন মাত্র তখন তিনি পেন্সেন লইয়াছিলেন, শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম,—"আগে বলতেন পেন্‌সন লইয়া খুব লিখিব—এখন?" মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।" বলিলেন, "রমেশকে (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) বলেছি, দিনকতক রঘুনাথপুরে বাঙ্গলায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে। কিন্তু সেখানে খাবার জলের কষ্ট। বেশ হল, কাঁথি হতে তুমি ভাল ভাল

ডাব পাঠাতে পারবে।” কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়া হয় নাই। স্থানটী আমার দেখা হয় নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সময় বাঙ্গালার চারিধার জলে পূর্ণ হইয়া যায়—অদূরে জমীদার ভূঁইয়া মহাশয়ের বাস-ভবনের চারি দিকে দূরবিস্তৃত ঘন বাঁশ বনের প্রাচীর, তাহাতে নির্ভয়ে হরিণযূথ ও ময়ুরময়ূরীগণ বিচরণ করিতেছে।

বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, অপরাহ্নে এই জীবগুলিকে স্বহস্তে আহার দান করা ভূঁইয়া মহাশয়ের দৈনিক কার্য্য, এবং সেই সমুদ্র-বেলা-ভূমে তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণের বিঘ্ন না হইতে পারে, এই উদ্দেশে তিনি সে অঞ্চলে শীকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছেন।

কাঁথি মহকুমার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয় পুত্র-গণের নাম এখনও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে;—কেন না, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাজনামুঠা পরগণার বন্দোবস্তের অবসরে সাধারণ লোকের বিস্তর হিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মেদিনীপুরে অবস্থিতিসময়ে বঙ্কিম-চন্দ্র সেখানকার জেলাস্কুলে পড়িতেন। তাঁহার হেড মুহুরী সেদিনও বাঁচিয়াছিলেন; বছর কতক হইল, প্রায় শতবর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যচপলতার অনেক গল্প করিতেন। ফলতঃ কপালকুণ্ডলার অনেক দৃশ্যের জন্য যে বঙ্কিম বাবু কাঁথির সুন্দর বালুকাশৈলশ্রেণী এবং সাগরোপকূলের কাছে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাঁথি হইতে ছয় মাস পরে বীরভূম বদলী হইবার সময় আবার

কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পিতার হেড মুহুরীর ও তাঁহার সন্তান সন্ততির কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, সাধারণতঃ মাজনমুঠার সকল লোকেই এখনও তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করে। তাহাতে সলজ্জে ও স্মিতমুখে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "কর্ত্তাদের দয়ার জন্য লোকে ভালবাসিত। আমরা বিচার করিয়া কড়া শাস্তি দিতাম, তাতে লোকে কর্ত্তার সঙ্গে তুলনা করে' আমাদের নিন্দা করিত।"

মনে পড়িতেছে, নবীনবাবু একবার পুরী অঞ্চল হইতে ফিরিয়া অসিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিতেছিলেন যে, তিনি গোটাকতক উড়িয়া কবিতা লিখিয়াছেন, পড়িয়া শুনাইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন কি না? বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন "উড়ে ভাষা আমি বুঝিতে পারিব না? ছেলেবেলায় দশ বার বছর পর্য্যন্ত উড়ের হাতে লালিত পালিত, আমি আর উড়ে বুঝতে পারব না?" মেদিনীপুরের, বিশেষতঃ কাঁথির উপর বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক টান ছিল।

কিন্তু সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদের প্রতি তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। আমার কাঁথি যাওয়ার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—"সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখিয়া ভুলিও না।"

আমার কৃষ্ণনগর যাওয়ার কিছুদিন আগে রাখালের হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়। বঙ্কিমবাবু নিজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় পদ্ধতি মতেই চিকিৎসা করিতে পারিতেন। স্বয়ং সচরাচর ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া লইতেন। সে যাহা হউক, অন্যান্য চিকিৎসায় কোনও

ফল না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন রাত্রে আমায় চিঠি লিখিলেন, যেন প্রাতে আমার আত্মীয় স্বর্গীয় সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন খুড়া মহাশয়কে লইয়া যাই। তিনি হোমিও-প্যাথির মত ছোট শিশিতে ঔষধ রাখিতেন। দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—"দেখি, দেখি, এ যে ঠিক হোমিও-প্যাথির মত।" আমি বলিলাম, "উনি দুই তিনটা ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়া চিকিৎসা করেন—তাহাতে বেশ উপকার হয়। এটা বেশ উন্নত পদ্ধতি।" বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হোমিও-প্যাথিমতে প্রত্যেক ঔষধ পৃথক্ ব্যবহার করা উচিত; তাহাতে উপকার হইতেছে। সে পরীক্ষার পর ইহাকে উন্নতি বলিতে পারি না।" যাহা হউক, প্রশংসিত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার উপর তাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল।

একবার সুলেখিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর সংস্কৃত নাটক সমালোচনার কথা তুলিয়া বঙ্কিম বাবু আমার অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্রের সম্মুখে আমায় বলিয়াছিলেন, "লেখিকার বয়স বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, ও বয়সে আমাদেরও অমন লেখা সহজ হইত না, তাঁহার সমালোচনা পড়িয়া নাটকগুলি আবার নূতন করিয়া পড়িতেছি।" শৈলেশ বলিলেন, "আপনি আর ত কিছু লিখিতেছেন না?" বঙ্কিম বাবুর বাটীর তখন সংস্কার হইতেছিল, হাসিয়া বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন "এখন আমারও লেখা ঐ রকম, কেবল পুরাতনের মেরামত ও চূণকাম।"

১৮৯২-৯৩ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে

বঙ্কিমচন্দ্র।

১

বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন ইংরেজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবরের সাইক্লোনে (Cyclone) ঝড়ে ও জলপ্লাবনে ডায়মণ্ডহার্ব্বার, কুল্পী, মুড়াগাছা, টেঙ্গরাবিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মণিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে ঝড়ে এ দেশের অধিকাংশ বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়; পরে, কয়েকটী সমুদ্র-তরঙ্গ বঙ্গোপসাগর হইতে বাত্যা-তাড়িত হইয়া আসিয়া সাগর-কূলবর্ত্তী দক্ষিণপ্রান্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দৈব দুর্ঘটনায় এ প্রদেশের বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিতহৃদয় হইয়া, কয়েক জন ধনশালী পারসী ও কতিপয় গবরমেণ্টের ইংরেজ কর্ম্মচারী ও এ প্রদেশের জমীদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্যদান করিয়া সত্বরই একটী প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাউল,

চিঁড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েক থান পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত সঙ্গে আমাকে লোকের অন্নাভাব ও পরিধেয়-কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ববর্ত্তী টেঙ্গরাবিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। দ্রব্যজাত-রক্ষার জন্য আমার সঙ্গে এক জন বন্দুকধারী পুলিস-কন্‌ষ্টেবলও প্রেরিত হয়। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে দেখিলাম, বহুসংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে, এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যে ও বনে জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি ও ভূমিতলে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। আমি যৎপরোনাস্তি কষ্টে সেই শবরাশি ও তন্নিঃসৃত পূতি-গন্ধ-দূষিত বায়ুরাশি ভেদ করিয়া সমস্ত দিবারাত্রির পর গন্তব্য-স্থান গঙ্গাধরপুরে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা সাতটা আটটা। আমি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র দুই তিন শত অন্নবস্ত্রক্লিষ্ট লোক আমার দ্রব্যজাত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আসিল। এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমি তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি, বণ্টনান্তেই চলিয়া যাইব, এই কথায় তাহারা প্রবোধিত ও স্থির হইতে পারিল না। আমি তখন পুলিসের বন্দুকটী লইয়া একটী ডোঙ্গার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং বলিলাম, "যে কেহ আমার ডোঙ্গা স্পর্শ করিতে সাহস করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ লইব।" ইহাতে তাহারা কিছু ভীত হইয়া অগত্যা আমার বণ্টন-প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তিন চারি দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মত প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন করিয়া

দিয়া মজিলপুরে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম, এবং তাঁহাকে দ্রব্যাদির হিসাব দিলাম। তিনি আমার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষ-কার্য্যের আধিক্য-প্রযুক্ত অল্পদিনের জন্য ডায়মণ্ডহার্ব্বার মহকুমার ভার গ্রহণ করিলেন। ডায়মণ্ডহার্ব্বার হইতে আসিয়া বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার লইলেন, এবং দুর্ভিক্ষ-কার্য্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষ-কার্য্যে বঙ্কিমবাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম, হেমবাবুকেও সেইরূপ সাহায্য করিতে লাগিলাম। সাইক্লোনের ফলে কেবল এই দুই মহকুমাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

এ সময় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের নূতন রেজিষ্টারী আইন অনুসারে মহকুমায় মহকুমায় নূতন রেজিষ্টারী আফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার নূতন রেজিষ্ট্রেশন আফিসের হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্র-চিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার লিখিত রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম, এবং সমস্তগুলিই পড়িতাম।

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতেছিলেন। এই সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-roomএ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টী লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না। "দুর্গেশনন্দিনী"র লেখা সমাপ্তপ্রায় হইলে, কিংবা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে, আমি তাঁহার পাঠকক্ষের টেবিলে কয়েক ভলুম স্কটের ওয়েবর্লী উপন্যাস সজ্জিত দেখি। তিনি হয় ত কোনও বন্ধুকে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন; বন্ধু তাঁহাকে Ivanhoe উপাখ্যান-ভাগের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান-ভাগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, বলিয়া থাকিবেন; তাহাতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ নূতন ওয়েবর্লী উপন্যাসাবলী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইবার পূর্ব্বে তিনি "Ivanhoe" পড়িয়াছিলেন কি না, তাহা আমি ঠিক বলিবার অধিকারী নহি। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা সত্যের অনুরোধে অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমি অগ্রে "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ করি; তাহার অনেক দিন পরে Ivanhoe অধ্যয়ন করি। বলিতে কি, আমি উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। আমি য়িহুদী রমণীর (Rebeca) চিত্র পাঠ করিবার সময় আয়েষাকে একটী মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই।

অন্যান্য পাঠকেরাও দুর্গেশনন্দিনীর চিত্রাবলীকে Ivanhoeর ছায়া বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। Ivanhoeর ছায়া লইয়া যে "দুর্গেশনন্দিনী" রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজমুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না, আমি বঙ্কিমবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণাকে অপসৃত করিয়াছি। কেন না, আমি তাঁহার Honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহা হউক, দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা যে সম্পূর্ণ একটি অভিনব সৃষ্টি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" মুদ্রিত হইয়া আসিলে তিনি আমাকে এক খণ্ড পড়িতে দিলেন। পাঠান্তে পুস্তক সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যানভাগের খুব প্রশংসা করিলাম, এবং লেখার সম্বন্ধে বলিলাম, পুস্তকের বাঙ্গালা ইংরেজির অনুবাদের ন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তখন আমার মন্তব্যে তাদৃশ্য তৃপ্তি লাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষদশায় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার লেখা আজও রীতিমত বাঙ্গালা হয় নাই। আজও দেখিতে পাই, স্থানে স্থানে যেন ইংরেজির অনুবাদ করিয়াছি।" তিনি আরও বলিলেন যে, "এখনকার প্রায় সমস্ত ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালায় এই দোষ।"

তিনি এই দোষ কেবল শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় খুব কম দেখিতে পান। নগেন্দ্রবাবু কখনও কখনও "বঙ্গদর্শনে" লিখিতেন। ইহাতে তাঁহার লেখার সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর পরিচয় হয়। বঙ্কিমবাবু নগেন্দ্রবাবুর কোনও গ্রন্থ কখনও পাঠ করেন নাই। আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন, কিংবা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোনও পুস্তকবিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম, তিনি শ্রবণ করিতেন, এবং স্থলবিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭৷৷০ হইতে ১১৷৷০ পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই "Light Reading" ছিল না। তৎসমস্তই গভীরচিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে; তাহাতে "Progressive Development of Species" বিষয়ে লেখা ছিল। তিনি অধ্যয়নে অসমর্থ থাকিলে কদাপি আমার এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।

এ সময় বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগর-নিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং সেখানে থাকিয়া

অল্পস্বল্প চিকিৎসা ব্যবসায়ও চালাইতেন। মহেশ বাবু কলিকাতা মেডিকাল কলেজের এক জন সুবিখ্যাত ছাত্র। তিনি ছাত্রাবস্থায় যেরূপ খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তাদৃশ বিখ্যাত ডাক্তার হইতে পারেন হন নাই। তিনি কোনও এক বৎসর কলেজের সাংবৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটী সুন্দর অণুবীক্ষণ যন্ত্র পারিতোষিকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * বঙ্কিম বাবুর সহিত মহেশ বাবুর আলাপ হইবার পর মহেশ বাবু সেই অণুবীক্ষণটী দিনকতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। বঙ্কিমবাবু প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অণুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ, এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্য সঙ্গী থাকিতাম। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেন, "জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত, আর আর সমস্তই সুন্দর।" এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপর উচ্ছ্বাস দেখি নাই; কখনও ঈশ্বরের নাম গুণ শুনি নাই; বা ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনও পরিচয় কখনও পাই নাই। কিন্তু আমার অনুমান হয়, এই সকল অণুপ্রমাণ সৃষ্টির

---

* বঙ্কিম বাবুর মুখে শুনিয়াছি, এই যন্ত্রটীর মূল্য ৪০০৲৫০০৲ টাকার ক ছিল না।

অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষগোচর করিবার সময় তাঁহার ভাবপ্রবণ অন্তরে বৈজ্ঞানিক-জাতীয় এক প্রকার ঈশ্বর-ভক্তির বীজ নিপতিত বা রোপিত হয়, যাহা তাঁহার প্রবীণ বয়সে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কথঞ্চিৎ সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বারুইপুরে অবস্থানসময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুই-পুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণ বাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোনও অভিমান দেখি নাই; বঙ্কিম বাবুতে কনিষ্ঠের কোনও সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোনও লজ্জাসরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কোনও বিষয়ে গোপনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না।

ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে "Rent Law" সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। লোকের মুখে শুনি-তাম, এখানি বঙ্কিম বাবুরই রচিত। বঙ্কিম বাবু এই পুস্তিকার প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। একবার হাইকোর্টের বিচারপতিদের "Rent Law" (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন)

সম্বন্ধে প্রত্যেকের সুবিস্তীর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে বাহির হয়। সেই মন্তব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে সঞ্জীব বাবুর “Rent Law” সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু হাইকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য-পুস্তিকা প্রাপ্ত হইবামাত্র, তন্মধ্য হইতে সঞ্জীব বাবুর পুস্তিকার উদ্ধৃত অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবং আমাকে দেখাইলেন। এই যত্ন অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ হইতেও বিকশিত হইতে পারে।

মধ্যে মধ্যে কবিবর বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগণার Assistant District Superintendent বাবু জগদীশনাথ রায় বঙ্কিম বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, এবং সকলে কয়েকদিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন। ইঁহারা উভয়েই গবরমেণ্ট কর্ম্মচারী, এবং ছুটীর সময় ভিন্ন প্রায়ই অপর সময়ে আসিতেন না। দীনবন্ধু বাবু বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের প্রবীণ হইবেন, এবং জগদীশ বাবু তাঁহা অপেক্ষা আরও বার চৌদ্দ বৎসর প্রবীণবয়স্ক। একবার বঙ্কিম বাবুর মজিলপুরে অবস্থিতিকালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি ৮৷৮৷৷টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের আগমনের কোনও সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্কিমবাবু যাহাতে তাঁহাদের গাড়ীর শব্দ শুনিতে

না পান, এমন স্থানে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন,—'আমরা বাগ-বাজারের (মেথরাণী)।" বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের ব্যঙ্গস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কালুয়া! নিকাল দেও, কালুয়া! নিকাল দেও!" এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

বঙ্কিম বাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের "Ten Sermons" নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "Such worst English I have never read"। আমি পার্কারের লেখার ও ইংরেজির খুব ভক্ত ছিলাম। তাঁহার হেয়জ্ঞান-সূচক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।

এই সময়ে বঙ্কিম বাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিল-পুরে আসিতেন, তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সে সময় ৺হর-মোহন দত্তের এষ্টেট কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্বয় ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে বাস করিতেছিলেন।

এই সময়ের কিছুদিন পরে আমি বারুইপুর পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হই। বঙ্কিম বাবু, ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেবের নিকট আমার অনেক প্রশংসা করেন, তাহাতে বেনব্রিজ সাহেব আমাকে বারাসতের সবডিভিসন্যাল হেডক্লার্কের পদে মনোনীত করিয়া পাঠান। ইহার পর বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার অল্পই দেখা সাক্ষাৎ হইত।

২

বঙ্কিম বাবুর বারুইপুরে অবস্থানকালে একটী দুর্ঘটনা হয়। তাহা অগ্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর কার্য্যতৎপরতা ও পর-হিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদিন মধ্যাহ্নকালে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যেই থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটী বজ্রপাত হইল। তাহার চারি পাঁচ মিনিট পরে একটী লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারীতে সংবাদ দিল, "রাজকুমার বাবুর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ুঃ হইয়াছে।" শুনিবা-মাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারীর সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহার অনু-গমন করিলাম। [এই রাজকুমার বাবু বারুইপুরের জমী-দার রাজকুমার চৌধুরী। তাঁহার বাটী ফৌজদারী নূতন কাছারীর পাঁচ ছয় রশি তফাতে]। আমরা বজ্রাহত বাটীতে গিয়া দেখিলাম যে, বজ্রটী গৃহসংস্কারে ব্যবহৃত একটী বাঁশের উপরেই নিপতিত হয়। বাঁশটী বজ্রাঘাতে শতধা বিদীর্ণ

হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে বিদ্যুদগ্নি আহত বাঁশটীকে পরিত্যাগ করিয়া সংলগ্ন দ্বিতল বাটীর উপরের ছাদের আলিশা আশ্রয় করিয়া, তাহা হইতে কিছু দূরে আসিয়া, ঘরের দেউল অবলম্বনে নীচের তলের একটী ঘরে নামিয়া আসে। নামিবার সময় দেউলের বালিকাম চুণকাম অঙ্গুলিপ্রমাণ পরিসরে উপর হইতে বরাবর সোজা খসিয়া পড়িয়াছে। নীচের ঘরে তিনটী লোক দেওয়াল ঠেসান দিয়া একটী মাদুরে বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল; সেই বেচারাই তখনই মৃত্যুমুখে পড়ে। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান একুশ বৎসর হইবে। দ্বিতীয় বজ্রাহতটী সম্পর্কে রাজকুমার বাবুর ভাগিনেয়। এই যুবাটী তখন সেই মাদুরের উপরে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

তৃতীয় বজ্রাহতটী রাজকুমার বাবুর তৃতীয় পুত্র। ইনি তখন অনুমান ষোল বৎসরেরও ন্যূনবয়স্ক। ইনি সচেতন অবস্থায় এদিক ওদিক করিতেছিলেন। ইঁহার অঙ্গের উরুদেশে একটী ছড় দেখিলাম। ইনি তখনও তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। ছড়টী উরুদেশের উর্দ্ধস্থান হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। রাজকুমার বাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বকীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার বাবু সেই দিন প্রাতের ট্রেণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। মৃত পুত্রটীর মাতা, পুত্রাঙ্গে কোনও বজ্রচিহ্ন না

দেখিয়া হয় ত মনে করিতেছিলেন, পুত্রটী শুধু অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। মৃতের অঙ্গে বস্তুতঃ কোনও চিহ্ন ছিল না। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কোনও স্থান দগ্ধ হয় নাই। কোমরের ঘুন্‌সীটী যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে; ঘুন্‌সীতে চাবিটীও যেমন ছিল, তেমনই আছে। বঙ্কিম বাবু চাবিটী গলিয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছিলেন। বজ্রপাতকালে আহতের মস্তক পতন-চিহ্নিত স্থান হইতে এক বিঘতের কিছু বেশী দূরস্থ ছিল। আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরী সাহেব অশ্বারোহণে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিম বাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন, এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া, রাজকুমার বাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। এ দিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবাটীর চৈতন্যসম্পাদন করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার মহোদয়গণের কোনও চেষ্টা সফল হইল না। বজ্রটী বোধ হয়, আহতের মস্তিষ্কদেশের সন্নিধানে আসিয়া আন্দোলনেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করিয়াছিল। ডাক্তারেরা অন্ততঃ তখন এই মন্তব্যে উপনীত হন।

আমি আমার নূতন কার্য্যে বারাসতে চলিয়া গেলে বঙ্কিম

বাবু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বারুইপুরে অবস্থিত ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম, বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন,—আদালতের কার্য্যের সময়েও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা-পরিদর্শন উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু একবার আলিপুর হইতে জয়নগর অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বিষ্ণুপুরের ডাক-বাঙ্গালায় একরাত্রি অবস্থিতি করেন। পরদিন প্রাতে তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার সঙ্গে তদুপলক্ষে দেখা করেন। আমি তখন মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান। মিউনিসিপালিটী হইতে দুটী দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুঘটনার বিবরণ আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু এতদঞ্চলে প্রেরিত হন।

আমার সঙ্গে দেখা করিবার পরই বঙ্কিম বাবু বাইশ-হাটা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যান। তাঁহার পূর্ব্বদিন কয়েক জন পুলিস-কর্ম্মচারী সেই গ্রামে গিয়া, যাহারা যথার্থই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, এবং অনাহারে বা কদর্য্য দ্রব্যাদির আহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসন্ধান-স্থল হইতে কৌশলে অনুপস্থিত করিয়াছিল; এবং যাহারা পুষ্টদেহ ও তৈলাক্ত-কলেবর, যাহাদের গায়ে দুর্ভিক্ষের বাতাস কিছুমাত্র লাগে নাই, পুলিস কেবল

তাহাদিগকে অনুসন্ধান-স্থলে উপস্থিত রাখিয়াছিল। ইহারাই পুলিস কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর কাছে দর্ভিক্ষের মায়া-কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মশাই, আমরা এবার খেতে না পেয়ে মরি, সরকারবাহাদুর এ সময় আমাদিগকে অন্ন দিয়া প্রাণে বাঁচান।" বঙ্কিম বাবু বাইশহাটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট তাঁহার অনুসন্ধানের ফল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। বঙ্কিম বাবু সত্য সত্যই পুলিসের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। যে লোকটী তথায় দুর্ভিক্ষে মৃত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, পুলিসের কৌশলে সে "রোগে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে", অনুসন্ধানে এইরূপ প্রকাশ পাইল। বঙ্কিম বাবু তৎপরে বাইশহাটা হইতে ফিরিবার পথে জয়নগরের সন্নিহিত হাটপাড়া গ্রামে মৃত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি অবশ্যই দুর্ভিক্ষে "অনাহার-প্রযুক্ত মৃত" বলিয়া প্রমাণিত হইল। পুলিসের কোনও কৌশলজাল এখানে বিস্তারিত হয় নাই। যদি পুলিস-রিপোর্টে এই মৃত্যুবিবরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে পুলিসের কোনও কৌশলজাল বিস্তার করিবার কারণ ছিল না। অথবা, স্থানটী জয়নগরবাসীদের অত্যন্ত সন্নিহিত বলিয়া পুলিস এখানে কোনও চাতুরী করিবার অবসর পায় নাই, বা সাহস করে নাই। বঙ্কিম বাবুর মুখে বাইশ-হাটার দুর্ভিক্ষ-বিবরণ শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। তাহা আমাদের সংগৃহীত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিম

বাবু আলিপুরে ফিরিয়া গেলে আমি পুলিসের চাতুরী অবগত হইলাম। এরূপ চাতুরী-অবলম্বনে পুলিসের অন্য স্বার্থ ছিল না। উপরওয়ালা হাকিমদের ভয়েই তাহাদিগকে এই চাতুরী অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সাহেব হাকিমদের কর্ণে দুর্ভিক্ষজনিত কষ্টের কথা বড়ই তিক্ত লাগে। থানার পুলিস-রিপোর্টে একবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা থাকাতে পুলিসের বড় সাহেব থানার দারোগার উপর বড়ই চটিয়া উঠেন। তাহাতে দারোগাটী মানসিক ও নৈতিক সাহসের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত খুব সতর্ক হইয়া যান। যখন ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বঙ্কিম বাবুকে এ অঞ্চলে পাঠাইলেন, তখন তাহাদের সহসা আশঙ্কা জন্মিল। যদি কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রমাণিত হয়, আর যদি তাহারা পূর্ব্বাহ্ণে উপরে সেই সংবাদ না দিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের উপর হাকিমদের সমস্ত তম্বী পাড়বারই কথা। দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলেও পুলিসের দোষ, না দিলেও তাহাদের দোষ! সেই জন্য শেষে দুর্ভিক্ষ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের উপর পাছে কোনও দোষ পড়ে, তজ্জন্য পুলিসকে এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ স্থলে পুলিসের অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ", এগুলেও দোষ, পেছুলেও দোষ।

বাইশহাটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব-রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্নান

আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎকরি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস—বঙ্কিমবাবুর স্বগ্রামে, কাঁঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব-সম্বন্ধ ছিল। উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে কমলাপতি বাবুর নিকট ইংরেজি পড়িতেন। আমার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সেইখানেই তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। আমি পূর্ব্বে "নবজীবন" পত্রে "বৈষ্ণব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতাম। "এখন আর কোনও প্রবন্ধ লিখি না কেন?" জিজ্ঞাসিলে, আমি তদুত্তরে আমার শারীরিক অস্বাস্থ্যের বিষয় বলিলাম,—"লিখিতে গেলে আমার বহুমূত্রের পীড়া বাড়ে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এরূপ স্থলে না লেখাই ভাল।" "শীঘ্র পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন"—এরূপ কথাও হইল। তিনি চিরকালই সাহেবদের গালাগালির বড়ই ভয় করিতেন, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন, যে কোনও উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবার উপযুক্ত আয় হইলে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কথাটা এই, তিনি বহুদিন হইতে অনেক সাহেবকে কাজ শিখাইয়া এক প্রকার মানুষ করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গেলেন। এখন যে সমস্ত তরুণবয়স্ক কার্য্যানভিজ্ঞ সাহেবেরা তাঁহার উপর হাকিম হইয়া আসিতেছে, তাহারা আবার উল্টে তাঁহাকে কাজ শিখাইতে ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যায়-রূপে ধমক দিতে চায়, এবং তাহাতে শ্লাঘা জ্ঞান করে। এরূপ দুর্ব্যবহার এখন তাঁহার ক্রমে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইয়াছি, একবার নাকি ২৪ পরগণার কোনও উদ্ধত ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার নিজ এজলাসের মধ্যেই কর্কশ ভাষায় "বঙ্কিম!" "বঙ্কিম!" বলিয়া ধমক দিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমবাবু নাকি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "You should see, I am no longer 'Bankim', now represent Her Majesty's Law and Justice. You know, I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting Her Majesty's Court of Justice." ইহাতে সাহেবটী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে বঙ্কিমবাবু পদের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় বঙ্কিমবাবু আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, আহার সম্বন্ধে এরূপ ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহ শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, এবং দেহশুদ্ধির জন্য সাত্বিক আহারে আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন। অনেক ইংরেজি-শিক্ষিতে নিকট হিন্দুর এই খাদ্যতত্ত্ব দুর্ভেদ্য সমস্যা হইয়া আছে। একদি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও লেখকে

সম্মুখে ঐ বিষয়ে ঘোর প্রতিবাদ করেন; তাঁহারা এই মতকে ঘোর জড়বাদ (materialism) বলিয়া মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীও এ মতের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র প্রবল প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। খাদ্য-তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার সত্য সত্যই বিড়ম্বনা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংঘটন-কালের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ইণ্টরন্যাশন্যাল এগ্‌জিবিশন্ ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সহসা সাক্ষাৎ হয়। সে সময় তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমি তখন কার্য্যগতিকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ "নবজীবন"-সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমবাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্কিমবাবু কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন, আমি কোনও প্রকার যোগাভ্যাস করি। তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই অক্ষয়বাবু বঙ্কিমবাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তা কহিতে আমার কোনও গুরুজনের বিশেষ নিষেধ-আজ্ঞা ছিল। আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ, ইহা আমি অক্ষয়বাবুর দ্বারা বঙ্কিমবাবুকে বলিয়া পাঠাইলাম। তার পর দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে রেজিষ্টারী আফিসের বাটীতে আমাদের

সেই দেখা। সেই দেখার সময় আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে গিয়া দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হই। তদনুসারে যখন প্রথম দেখা করি, তখন বঙ্কিমবাবু পেন্সন লইয়া কলেজ ষ্ট্রীটে প্রতাপ চাটুর্য্যের গলির বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

প্রথম সাক্ষাতে তিনি আমাকে "কৃষ্ণ-চরিত্রে"র দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতে অনুরোধ করেন। আমি তাহা অধ্যয়ন করিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বস্তুতঃ তাহা পাঠ করিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণপরম্পরা অবলম্বন করিয়া মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ও মৌলিক অংশ নির্দ্দেশিত করেন, তাহাতে আমি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তি দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক্ হই। কিন্তু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-চরিত্র-স্থলে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় বঙ্কিমবাবু অতি অল্পই সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের যে অনুচিত ধারণা ছিল, তাহার তিনি অনেকটা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু লোকে যে এখন শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবুর আদর্শচরিত্র-জ্ঞানে স্ব স্ব গুরুপ্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক উপাসনা করিতে যাইবে, ইহা বঙ্কিমবাবুর ওরূপ চেষ্টা দ্বারা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সেরূপ চেষ্টা দ্বারা শুদ্ধমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক দোষ সাধারণের চিত্তবৃত্তি হইতে অপসারিত

হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা উপাসনার ভাব অভিনবভাবে লোকের অন্তরে উদ্দীপিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণোপাসনাতে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়া চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় স্বয়ং বৈরাগ্যব্রত-গ্রহণানন্তর সাঙ্গোপাঙ্গে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া লোক মাতাইবার প্রয়োজন ছিল। এরূপ বৈরাগ্য-ব্রতের অনুব্রতী হইয়া চেষ্টাপর হইতে পারিলে, এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী উৎসাহী প্রচারক-দল স্বকীয় আদর্শে সংগঠিত করিয়া দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহার অভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইবার আশা থাকিত। খ্রীষ্ট-জগতে যেমন খ্রীষ্টোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এক্ষণে সেরূপ সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার আশা স্বভাবতঃই খুব অল্প। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এ পক্ষের চেষ্টাও এ পর্য্যন্ত এক প্রকার ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও কথা ঠিক করিয়া বলিবার কেহই আমরা অধিকারী নহি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। শুদ্ধ নীতির আদর্শ সাধারণ মানুষের মনঃপূত হইবার নহে। এ সংসারে তা-বড় তা-বড় প্রচুর নীতির আদর্শ আছে। তাহারা কখনও কাহারও লক্ষ্য-স্থলে আইসে না। সাধারণ মানুষে এক জন উপাসকের আদর্শ চান—এক জন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রের এ অভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" পুস্তকের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি করিবেন কাকে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করায় তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি আরও দূরস্থিত ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যখন আমার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়, তখন তিনি উপরি-উক্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন, এবং বলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বা ভক্ত-জীবনের সংবাদ-সংগ্রহের জন্য বিষ্ণু-পুরাণাদি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া কোথাও কিছু পান নাই। আমি বলিলাম, "বৈষ্ণব পূর্ব্বাচার্য্যগণও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের এ অভাবটী বিলক্ষণ বুঝিতেন। এ জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জের টানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে পরিণত করিয়া একটী সম্পূর্ণ আদর্শ-স্থানীয় করিতে কতকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের, প্রতিভার, বুদ্ধিমত্তার, তত্ত্বজ্ঞানের, নৈতিক অনুভূতির ও নিষ্ঠার অবতার, তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তির অবতার ও ভক্তের আদর্শস্থল। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ অভাব, এবং শ্রীগৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণবিকাশ, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির, আস্থা বিশ্বাসের, নির্ভরের ও আনুগত্যের পূর্ণ অসদ্ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গে তাহাদের পূর্ণ অভি-ব্যক্তি। বৈষ্ণব পূর্ব্বাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, উভয়ের একী-করণে একটী পূর্ণ আদর্শ-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে তাহা কুলায় নাই, শুদ্ধ গৌরাঙ্গেও তাহা কুলায় নাই। যেমন তাঁহাদের রাধা ও কৃষ্ণ লইয়া একটী সত্তাসৃষ্টি, তেমনই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া একটি সত্তার স্ফূর্ত্তি।"

নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একদিন বঙ্কিমবাবুকে কৃষ্ণচরিত্রে বৈরাগ্যের অভাবের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যহীন জীবন কিরূপে লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবে? এ কথায় বঙ্কিমবাবু প্রায় নিরুত্তর হন। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্থাপকমাত্রই বিরাগী। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যপ্রভু বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল। ঈশা, মহম্মদ, নানকও বৈরাগ্যের বড় সামান্য দৃষ্টান্তস্থল নহেন। ভারতের সমস্ত ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরাই সন্ন্যাসী। এক বুদ্ধদেব ব্যতীত ইঁহারা সকলেই ভক্ত-বিশ্বাসী। বুদ্ধ-চরিত্রে ভক্তি বিশ্বাসের অভাব কেবলমাত্র এক বৈরাগ্য দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল কথাবার্ত্তার সময় বঙ্কিমবাবু কখনও অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহা তাঁহার গভীর সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

একদিন আমি কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম যে, আপনি কৃষ্ণ-চরিত্রকে দুরপনেয় কলঙ্করাশির আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য অবশ্যই আপনি বর্ত্তমানের, বিশেষতঃ ভবিষ্যতের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার চেষ্টা প্রথম ও সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী নহে। আপনার পূর্ব্বে স্বামীজী শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টাপর হন। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দল হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় একবার কৃষ্ণচরিত্র-

উদ্ধারের চেষ্টা হয়। বঙ্কিমবাবু এ বিষয়ের কোনও সংবাদ অবগত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমিই তাঁহার প্রথম সংবাদদাতা।

এতদ্দ্বারা এবং আরও নানাবিষয়িণী কথা দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্যের, বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সাহিত্যের কোনও ধারই ধারিতেন না, এবং কোনও সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় এক জন ধর্ম্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্য-পোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব। তিনিই কেবল তাঁহার সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাস্তবিক স্যামুয়েল জনসনের স্থানীয় ছিলেন। যদি তিনি বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যের রীতিমত তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলের হইত।

বঙ্কিমবাবু পুত্র-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যা দৌহিত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। দৌহিত্রদিগের সঙ্গে তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটীকে হার্মো-নিয়ম বাজাইতে ও তৎসঙ্গে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাহাদের সঙ্গে খুব বন্ধুভাবে মেশামিশি না করিলে তাহারা অন্যত্র বন্ধু অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে। অন্য সঙ্গে নষ্ট বা বিকৃত হইবার বাধা কি? একদিন তাঁহার যুবক দৌহিত্রটীকে ডাকিয়া আমাকে তাহার গান-বাদ্য শুনাইলেন।

৩

একদিন বঙ্কিম বাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, পথিমধ্যে এক জন একখানি হ্যাণ্ডবিল আমার হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সিকাগো মহামেলা হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে হাবড়ার রেলওয়ে-ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্মাননা ও অভ্যর্থনার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেখানি বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে দিলাম। বঙ্কিম বাবু তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যথাসময়ে তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন, এবং আমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। অভ্যর্থনার দিন এক মাঘের একাদশ দিবস। আমি বলিলাম যে, আমার শরীরে কোনও প্রকার হিম সহ্য হয় না; আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও অভ্যর্থনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, "আমার কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। আমার খুবই হিম সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্র আদবেই সহ্য হয় না। একটু রৌদ্র গায়ে লাগিলে আমার দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।" একদিন দেখিলাম,—তাঁহার যুবক দৌহিত্র সে দিন বিকালে প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করিবে—তিনি দৌহিত্রটীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলেন। গাড়ীটী তাঁহার বাটীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, এবং দৌহিত্রটীকে

গাড়ীতে তুলিয়া দিতে দুই চরি মিনিটের অধিক সময়ও লাগিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বঙ্কিম বাবু ছত্রহস্তে তাহার অনুগমন করিলেন, এবং ছত্রটী খুলিয়া পশ্চিমাভিমুখে বহির্দ্বারে রৌদ্র হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমবাবু রৌদ্র হইতে এত সতর্ক হইতেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব ছিল। আমি উক্ত মহাত্মার কোনও গুণ কীর্ত্তন করিলে, তিনি তাহাতে বড় একটা অনুমোদন প্রকাশ করিতেন না। উক্ত মহানুভব পুরুষ নিজের লেখায় বা কথায় কখনও কোনও প্রচলিত উপাস্য দেবদেবীর প্রতি বা প্রচলিত শাস্ত্রসমূহের প্রতি কোনও প্রকার অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, এ কথা বলাতে বঙ্কিম বাবু তাহাতে সায় না দিয়া কতকগুলি খৃষ্টীয় পুস্তিকা বাহির করিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "Quotations from the writings of Ram Mohan Roy" উদ্ধৃত ছিল। তাহার এক স্থানে দেবদেবীর যথেষ্ট নিন্দাবাদ দেখিলাম। কালীমূর্ত্তির বর্ণনায় উক্ত মহাত্মা যে কেবল শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তা নয়, গভীর অশ্রদ্ধাও দেখাইতেও ত্রুটী করেন নাই। সে সমস্ত পাঠ করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম যে, "হয় ত এই সমস্ত লেখা রাজার অপরিপক্ক বয়সের। রাজা যে সময়ে তাঁহার Appeals to

the Christian Public প্রকাশ করেন, কিংবা আরও পরিপক্কতর বয়সে যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত Trust Deed পত্র প্রকাশ করেন, সে সময়ে নিশ্চয়ই দেবদেবীগণকে এরূপ নিন্দাবাদ করিবার প্রবৃত্তি রাজার মনে সম্পূর্ণ সংযত হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়ে রাজার লেখাতে দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের ও লোকের উপাস্য দেবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতেন।

নববিধান-প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুই জনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া পড়েন। আমি তখন বারুইপুরে অল্পদিন-মাত্র বঙ্কিম বাবুর অধীন আছি—যখন তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" আলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করে নাই—যখন তাঁহার যশঃ-সূর্য্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোনও স্থলে একদিন কেশব বাবুর সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "I wish to know how far you have outgone me." এ কথা কেশব বাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি, সে সময় কেশব বাবুর জিজ্ঞাসা-মতে আমার সম্বন্ধেও বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়। সে কথা যাউক, বঙ্কিম বাবু কোনও

ক্রমেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার প্রবর্ত্তক মহাশয়ের সঙ্গে তুলনীয় মনে করিতেন না। এই কথাবার্ত্তার সময় প্রতাপ বাবু সিকাগো মহামেলা উপলক্ষে আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে প্রতাপ বাবুর বক্তৃতাদি সে দেশের, এ দেশের ও অন্যান্য সভ্য দেশের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি প্রতাপবাবুর লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "প্রতাপ বাবু গুছিয়ে গাছিয়ে বেশ ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে পারেন, এবং শেষে যাহা দাঁড় করান তাহাও মন্দ হয় না, বরং ভালই হয়।" As a leading power failure; নেতৃত্বশক্তি বিষয়ে তিনি প্রতাপ বাবুকে সম্পূর্ণ Failure বা অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করেন। কেশব বাবুরও Leading power তাঁহার মতে খুব বেশী ছিল না, তিনি বলিলেন যে, "অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া কেশব বাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সংবরণ করিতে না করিতে সেই অসংসক্ত দলটী বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।" আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, "কেশব বাবুর অনুবর্ত্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান্, শ্রদ্ধাস্পদ ও সাধুচরিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মানুরাগ সমধিক প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে, তাহা মনে হয় না। তাঁহারা একদিন কেশব বাবুর নাম রক্ষা করিতে সমর্থ

হইতে পারেন।" এ কথায় তিনি বলিলেন,—"কালীনাথ, তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে, ও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। উহার যে অবসাদ-দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখনও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায়ের "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "গৌরবাবু এক জন সুপণ্ডিত লোক ; শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ জন্য তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যেমন ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে, তেমনই যুক্তি দ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে সহসা এক আধটী প্রচলিত ইতর শব্দ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার লিখন-প্রণালীর সমর্থন করিবার জন্য কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিয়াছিলেন।

সঞ্জীববাবু (বঙ্কিমবাবুর মধ্যম ভ্রাতা) "জাল প্রতাপচাঁদ" অভিধেয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচন্দ্রের "প্রতাপচাঁদ" নামক একটী পুত্র ছিলেন। তিনি কোনও কারণে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া

পিতার রাজত্বকালে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। তজ্জন্য তিলকচন্দ্র মহাতাপচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া রাজত্ব-রক্ষার ভার নাবালক মহাতাপচন্দ্রের জন্মদাতা গোপালবাবুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কিছুকাল পরে "প্রতাপচাঁদ"-নামধারী কোনও ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমান রাজসম্পত্তির (claimant) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। এই পরিচয় দিবার পর নামধারীকে কোনও মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অবসর দেওয়া হইল না। নাবালক রাজের অভিভাবক গোপালবাবু বর্দ্ধমান এষ্টেটের বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার অকাতরে ও মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া নামধারী দায়াদ ও তাহার পক্ষীয় লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া উড়াইয়া দেন। নামধারী কোথাও দাঁড়াইবার ভূমি পান নাই। সঞ্জীববাবু এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া তাঁহার পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, "মেজদাদা জন-প্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর অবিচারে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকার বর্ণিত ঘটনা-পুঞ্জের ঐতিহাসিক মূল তিনি অতি অল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমার খুব বাল্যকালে এই নামধারীর আখ্যান জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিতাম, এবং সহানুভূতিতে কাঁদিয়া গণ্ডস্থল ভাসাইতাম।" আমি বলিলাম যে, "দায়াদের যখন বহুতর ভূম্যধিকারী সহায় থাকিতে এবং খ্যাতনামা জনসাধারণ-হিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিগত অভিন্নত্বের (Identity) সাক্ষী সকল

থাকিতেও দেওয়ানী আদালতে তাঁহাকে মোকদ্দমা রুজু করিতেও রাজকীয় ও অন্যদীয় পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, তখন নামধারীর প্রতি অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।"

ফরাসী সম্রাট নেপোলেয়োঁ বোনাপার্ট সম্বন্ধে আমি বঙ্কিম বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে বিষয়ে ইংরাজী কুসংস্কার (English Prejudice) পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছে। তিনি উক্ত মহাত্মার প্রতি 'নৃশংস' ভিন্ন কোমলতর আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বোধ হয় সার ওয়াল্টার স্কট, বুরিণ, আলিসন প্রভৃতি বিপক্ষ-বৃন্দের জীবনচরিত ও ইতিবৃত্তসমূহ পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে এই ঘোর অমূলক কুসংস্কারকে বদ্ধমূল হইতে দিয়া থাকিবেন; লাকেশ, হাজলিট, আবট, কর্ণেল নেপিয়ার, স্লোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন নাই।

বঙ্কিমবাবু ইয়ুরোপীয় ও অপর বিদেশীয় লোকের মুখে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা মনে করিতেন। এ জন্য তিনি আনী বেসাণ্ট প্রভৃতির বক্তৃতাদির প্রতি কোনও অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। বরং তিনি শ্রদ্ধাপদ শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিত-গণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির প্রতি আকর্ষণ দেখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এখন সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কি না?" আমি উত্তরে বলিলাম, "সিদ্ধ-

যোগী অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহাদের দর্শন-লাভ বা তাঁহাদের উপদেশলাভ ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্য পাত্রের সৌভাগ্য ও সুকৃতির অপেক্ষা করে।" "যোগ" সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তিনি তাহা জানিতেন। এ জন্য সে সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। যদিও প্রথমে এই জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কালীনাথ! তুমি কোনও প্রকার মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস কর কি না?" আমি বলিলাম, "আমি খুব বিশ্বাস করি। আমার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন। তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্বর্ত্তী মুক্তাগাছার এক জন জমীদার। কামাখ্যা হইতে একটী ব্রাহ্মণতনয় অনেক মন্ত্রাদি শিখিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার বন্ধুটী তাঁহার কাছে তৎ-শিক্ষিত কোনও মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎপরিচয় দেখিতে চান। তাহাতে ব্রাহ্মণতনয় একটী উদ্ভিদ্-লতার উপর তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্র-শক্তি-বলে লতাটী যে দিকে ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া, সুস্থির হইল।" আমার কথা শেষ হইবামাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটী জানেন। সেই মন্ত্রটী কোনও মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলেও মানুষের মন মন্ত্র-প্রযোক্তার ইচ্ছার বশীভূত হয়। তিনি এই মন্ত্রটীর কোনও বিপ-

রীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না। তবে হাকিম বা সাহেব বশীভূত করিবার জন্ত তিনি অনেক লোককে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। একবারমাত্র তিনি কোনও হতভাগিনী রমণীকে তাঁহার অনন্থরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটীর প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটী তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অযথা অপব্যবহার করে। মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মন্ত্রশক্তির ফলোপদায়িতা যেরূপ নষ্ট হয়, আমি তাহার একটী ঘটনা বিবৃত করিলাম। ঘটনাটী আমি শ্রীমৎ অচলানন্দ তীর্থ-স্বামীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করি। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রম উত্তরপাড়ার সন্নিহিত কোৎরং গ্রাম। সেই আশ্রম খ্যাতনামা রামকুমার বাবাজীর। বাবাজী অবশ্য তাঁহার পদবী নহে। তবে 'বাবাজী' শব্দ লোকে তাঁহার 'পদবী'-রূপে প্রয়োগ করিত। স্বামীজী যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট বৃশ্চিক-দংশন আরোগ্যের একটী মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রটী পাইবার জন্ত স্বামীজী পূর্ব্ব হইতে বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের নিকট সে আগ্রহ কখনও প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব মন্ত্রোচ্চারণান্তে দষ্ট স্থানে থু থু করিয়া তিনবার থূৎকার করিতেন। সেই অব্যর্থ মন্ত্রশক্তির বলে, যাহারা আসিত, সকলেই সকল সময় আরোগ্য লাভ করিত। দৈবযোগে একদিন স্বামী-

জীর মাতামহী বৃশ্চিক-দষ্ট হন। সেই দংশনে বা হুলাঘাতে মাতামহীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দংশন গোপনীয় স্থানে হওয়ায় স্বামীজীর পিতৃদেব আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দষ্টস্থানে ফ্ৎকারের সহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, অগত্যা স্বামীজীকে ডাকিয়া প্রয়োগের কৌশল সহিত মন্ত্র দীক্ষা দিলেন, এবং স্বামীজীকে তাহা তাহার মাতামহীর দষ্টস্থানে যথাবিধানে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। প্রয়োগমাত্রই মাতামহীর অসহ্য যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল। স্বামীজী তৎপরে শত শত লোককে সেই মন্ত্রবলে আরোগ্য করেন। একদিন মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পিতৃদত্ত বৃশ্চিক-দংশন আরোগ্যের মন্ত্রের সফলতার কথা বলেন। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে কেহ বলিল যে, হয় ত শুদ্ধ ফূৎকারে আরোগ্য হয়; মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নহে। এই কথাতে স্বামীজী পরে তাঁহার মন্ত্র সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় বিশ্বাসটী পরীক্ষা করিবার জন্য কোনও ব্যক্তির দষ্ট স্থানে বিনা মন্ত্রোচ্চারণে কেবল শুদ্ধ ফূৎকার দিলেন। তাহাতে জ্বালা নিবারিত হইল না দেখিয়া সেবার তিনি যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফ্ৎকার দিলেন; তাহাতেও কোনও উপকার দর্শিল না। তারপর স্বামীজীর সে মন্ত্র চিরকালের তরে অসিদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্র-প্রয়োগ কদাপি বিফল হয় নাই। এই ঘটনাটী দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানকৃত পরীক্ষাপেক্ষা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকতর পক্ষপাতিনী।

এই কথার পর Magnetism, will-power ও গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। নিম্নে তাহার স্থূল মন্তব্য অভিব্যক্ত হইতেছে। আমাদের উভয়ের মতেই মন্তব্যগুলি স্থিরীকৃত হয়।

(ক) শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে রোগাদি আরোগ্য হয়, এবং হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি সকল সময়ে স্থায়ী নহে। প্রয়োগকর্ত্তারই (Magnetiserএর) শরীর ও মনের বল ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার সাফল্য নির্ভর করে। প্রয়োগকর্ত্তার প্রয়োগাধীন ব্যক্তি (Subject) অপেক্ষা অধিকতর মহাজনভাবাপন্ন (more positive) হওয়া চাই। পক্ষান্তরে, এই ইচ্ছাশক্তি কোথাও কখনও (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ নহে। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে। অতি অল্প স্থলেই তিনি তাহার প্রয়োগ করেন। এই ইচ্ছাশক্তির সমধিক প্রয়োগ ও ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেহগত স্বাস্থ্য ও বল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

(খ) গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রদাতার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে, এবং তাঁহার আজ্ঞার উপর সমধিক নিষ্ঠা (Implicit obedience) না থাকিলে, কোথাও ফলদায়ী হয় না। মন্ত্রপ্রয়োগকালে মন্ত্রদাতাকে স্মরণ করিতে হয়, এবং আপনার শক্তি সাধ্যের অহঙ্কার বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রদাতার শক্তি সাধ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। যথানিয়মে প্রযুক্ত

মন্ত্রশক্তি সকল স্থলেই (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ। ইহা কোথাও নিস্ফল হয় না। ইহার যথেষ্ট ব্যবহারে শরীরের বলক্ষয় হয় না, ইচ্ছাশক্তিরও সাহায্য লইতে হয় না। প্রয়োগকালে যে মনের বল উপস্থিত হয়, তাহা আপনা হইতে অতি সহজে শুদ্ধ মন্ত্রের বলে উপস্থিত হয়। এই মন্ত্র-শক্তি শুদ্ধ ভক্তির বলে ফলোপদায়ী হইয়া থাকে। ইচ্ছা-শক্তির স্থলে যেমন নিজের মনের বলই সহায়, গুরুদত্ত মন্ত্র-শক্তির স্থলে তেমনই শুদ্ধ দৈব বলই সম্বল। ইচ্ছাশক্তি কাহাকেও কখনও প্রদান করা যায় না, কিন্তু মন্ত্রশক্তি গুরুপ্রণালী-ক্রমে অনায়াসে উপযুক্ত পাত্রে সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইতে পারে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে বঙ্কিম বাবু বলিলেন যে, তাঁহার দুই জন মন্ত্রশিষ্য আছেন। তাঁহারা তাঁহার প্রণালী-ক্রমে ইষ্টোপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি শিষ্যদ্বয়ের ভক্তি-বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণী মন্ত্রটী তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। এই শিষ্যদ্বয় বঙ্কিম বাবুরই উপাসনা-প্রণালীর অনুগত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং প্রচলিত গুরুপ্রণালীক্রমে ইষ্টোপাসনা পরি-ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের কৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া যান, তাহাই বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের অবলম্বন হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে স্তোত্র, শ্লোক ও মন্ত্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত

করিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত করেন, বঙ্কিম বাবু সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্তোত্র ও শ্লোকাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া নিজে তাহা অবলম্বন করেন, এবং শিষ্যদ্বয়ে তাহা প্রবর্ত্তিত করেন। সঙ্কল্পিত পরীক্ষান্তে এই শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার আকর্ষণী মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন কি না, এবং আমার সঙ্গে এই আলাপের পরে আরও অধিক মন্ত্রশিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু এ কথাবার্ত্তার পাঁচ ছয় মাস পরে তাঁহার জীবনলীলা সংবরণ করেন।

তিনি একদা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের উপাসনার সময় সম্যকরূপে মনঃস্থির করিতে পারেন না। কোনও বিশেষ শব্দ, বা লোকের কথাবার্ত্তা, বা বালকদিগের অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, তাঁহার চিত্তবৃত্তি অস্থির হইয়া উঠে। এমন কি, উপাসনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাকে উপাসনায় ভঙ্গ দিয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা উঠিয়া দেখিয়া সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হয়। আমি বলিলাম যে, পরিবারস্থ সকলের প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বা মায়া থাকাতে সর্ব্বদাই তাঁহাকে চঞ্চল করে, এবং তাঁহার উপাসনায় বাধা জন্মায়। কে কোথায় পড়িয়া গেল, কে কোথা হইতে কোন ব্যথা পাইল, কোন্ দিক হইতে কোন্ আপদ আসিয়া

উপস্থিত হইল, এই সমস্ত মায়িক আশঙ্কা মনোমধ্যে সর্ব্বদা উদিত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, এবং বিক্ষেপ জন্মায়। তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে স্নেহার্দ্রতা হইতে একটু কঠিন করিয়া না তুলিলে স্থিরচিত্তে তাঁহার উপাসনা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যে তাঁহার উপাসনার বাধা, এ কথা তিনি অস্বীকার করিলেন না। মনের বশীকরণ-শক্তির অসদ্ভাবই যে অধিকাংশ উপাসকের বাধা হইয়া আছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই চঞ্চল্যনিবারণার্থ বহুতর সাধককে অষ্টাঙ্গ যোগাদি অভ্যাস করিতে হয়। অবশ্যই কোন প্রকার যোগের কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই, এবং নিষেধ ছিল বলিয়া আমি তাঁহাকে বলিতে পারি নাই। তাঁহার চিত্তবৃত্তির অস্থিরতার আর একটী কারণ তখন আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাছে সে কথা বলিলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য তখন তাহা তাঁহাকে বলিতে বিরত ছিলাম। সে কারণটী উপাসনা সম্বন্ধ গুরুপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিজের উপাসনার জন্য নিজকৃত প্রণালীর অবলম্বন। বঙ্কিম বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজে উপাসনা করিতেন, সেই উপাসনার মূলে গুরুদীক্ষা বা গুরুভক্তির সাহায্য ছিল না। তাঁহার আত্ম-জনিত নিষ্ঠার সদ্ভাব ছিল না। এই জন্য কাহারও আপনাকে আপনার গুরু-স্থানীয়-রূপে বরণ করা বিধেয় হয় না। যে দৈব বা অদৃশ্য শক্তি (Providence) গুরুপ্রণালীর মূলে

বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার প্রাণ ও সহায় হইয়া আছেন, আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলে, সে সাহায্য-প্রস্রবণ হইতে নির্ব্বিন্ন হইয়া পড়িতে হয়, সুতরাং সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিম বাবু সেই সাহায্য-স্রোত হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। যাহা—যে শক্তি শুদ্ধ Rationalism-এর—বৌদ্ধ ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাই কেবল তাঁহার সহায় ছিল। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির পূর্ব্ব বর্ণিতরূপ বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।

বঙ্কিমবাবু যেরূপ স্বকীয় বা স্বকৃত উপাসনা-প্রণালীর অধীন হইয়াছিলেন, পূর্ব্বাচার্য্যগণের কেহই নিশ্চয়ই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান নাই। স্মার্ত্ত মহোদয় যখন ব্রাহ্মণগণের জন্য উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করেন, তখন তিনি নিশ্চয় নিজের গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন অনুবর্ত্তীদিগের জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন পুরী গোস্বামীর প্রদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায়" ও তাঁহার প্রদর্শিত উপাসনা-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণমন্ত্র, বা স্বকৃত পূজা-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যেও কাহাকেও তাঁহাদের গুরুমন্ত্র ও গুরুপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণমন্ত্র ও স্বকৃত উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ ও বাধ্য করেন নাই। কেবল বিশ্বাস ও ভক্তির পরীক্ষার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের জনৈক রামাৎ বৈষ্ণবকে কৃষ্ণনাম করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাকেও

তাহা করিতে বাধ্য করেন নাই। কোনও প্রণালী-প্রবর্ত্তক স্বকীয় গুরু-প্রণালী বিসর্জ্জন করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। যিনি তাহা করেন, তিনি তাঁহার ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আমরা বঙ্কিম বাবুকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভিন্ন কখনও অন্য কিছু ভাবি নাই। তাঁহার লেখায় কৃষ্ণাবতার-স্বীকার ও ভক্তিতত্ত্বের কথা থাকিলেও, তিনি পূর্ণমাত্রায় বৌদ্ধভাবাপন্ন (rationaliste)। ব্রাহ্মচূড়ামণি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের সংস্রব পরি-ত্যাগ করিয়া যখন ব্রাহ্ম উপাসনা-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক বৌদ্ধভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?

মধ্যে বঙ্গীয় যুবকসমাজে সাহেবিয়ানার ঘোর প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকেই আহারের সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করেন ; গৃহ মধ্যেও বস্ত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পেণ্টুলেন শার্ট ব্যবহার করেন, এবং ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিবার পরিবর্ত্তে আহারের জন্য টেবল ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করেন। অনেক যুবক এইরূপে বিলাতী সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খান। বঙ্কিম বাবুও এই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া তৃণের ন্যায় নীয়মান হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। এ সম্বন্ধে একদা তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার না করিয়া হাতে তুলিয়া খাওয়া বড়ই ঘৃণার বিষয় ও ঘোর অসভ্যতা মনে করিতেন। এরূপ অসভ্য ব্যবহার তাঁহার

চক্ষে পড়িলে তাঁহার অন্তরে বড়ই ঘৃণার উদয় হইত। একদিন তিনি কাঁটা চামচ হস্তে একটী কৈ মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃপুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইতেছিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন! তিনি বলিলেন, "কি বিড়ম্বনা! উপায় থাকিতে কি কর্ম্মভোগ!" এই কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে সময়ের স্রোত বিপরীত দিকে ফিরিবার উপক্রম হইতেছিল। এই স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারও সাহেবিয়ানা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এ দেশে যে এ স্রোত এখন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে তিনি যার-পরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বঙ্কিম বাবুর পিতৃদেব পুজনীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক জন সন্ন্যাসী গুরু বা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া তঁহার মৃত্যু-ঘটনার ঠিক সাত দিন পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অঙ্গীকার করিয়া যান। এই অঙ্গীকারমত যাদববাবুর মৃত্যুর ঠিক সাত দিন পূর্ব্বে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া যাদব বাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যাদব বাবুর কোনও পীড়ার সময় এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান 'পাঠক'।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের কথা লেখা যাইতেছে। তখন পিতৃব্য-দেব বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বহুবাজারের চৌমাথার নিকট ৯২ নম্বর কি এমনি একটা নম্বরের বাড়ীতে থাকিতেন। "বঙ্গ-দর্শন" প্রেস তখন কাঁঠালপাড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় তখন "বঙ্গদর্শন" বাহির হয়।

আমি তখন চাকুরীর উমেদার। কাঁঠালপাড়া হইতে প্রায়ই কলিকাতায় যাতায়াত করি; সেখানে আফিস অঞ্চলে ঘুরি। আমাকে বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, সকলেই স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন, "আমাদের দ্বারা বাপু, কিছু হইবে না; নিজে চেষ্টা করিয়া যাহা পার, কর।"

কাজেই কলিকাতায় সমস্ত দিন টো-টো করিয়া সন্ধ্যার সময় পিতৃব্য-নিকেতনে ফিরিয়া আসিতাম। কিছুতে মন বসিত না। তবে সেখানে একটা মূর্ত্ত হাস্যরস ছিল। তাহাতেই কোনও রকমে—কোনও রকমে কেন, এক প্রকার আনন্দেই কাটাইতে পারিতাম।

সে হাস্যরস পিতৃব্য মহাশয়ের জামাতা, কনিষ্ঠা ভগিনীপতি রাখালচন্দ্র। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক ছিলাম। দৈব-দুর্ব্বিপাকে রাখাল আজি অনেক বৎসর হইতে পরলোকে।

আমাদের চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীকে রাখাল "Royal Family" বলিত! এই "লব্‌জে"র উপযোগিতা সে অনেকবার, অনেক প্রকারে, নানা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া আমাকে বুঝাইয়াছিল। আমি সান্ধ্য-মুহূর্ত্তে, উমেদারীতে বিফল-প্রয়াস হইয়া প্রত্যাগত হইলে, সে আমাকে হাসিয়া বলিত, "দেখিলে ত, আমি বলি নাই? Royal Familyর ছেলে চাকুরী করিবে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? আর যাইও না। Don't make a fool of yourself any more."

কথায় রাখাল কাহাকেও ছাড়িত না। কারণ পাইলে সকলেরই লাগিত লাগিত, কিন্তু উহারই মধ্যে একটু যথাযোগ্য ভাবে রাগাইয়া দিয়া পরে সকলকেই হাসাইত। শ্বশুরও যে তাহার নিকট একেবারেই বাদ যাইতেন, তাহা নহে। তবে শ্বশুর জামাতার উপর রাগ করিবার বড় কিছু প্রকাণ্ড অজুহাত পাইতেন না। এই প্রবন্ধেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাকামহাশয়ের এক জন দরওয়ান ছিল। নাম, কি-একটা "পাঠক"। এখন তাহা আমার মনে নাই। পাঠক বাটীর ভৃত্যাদির এবং রাখাল ও আমার নিকট "মহারাজ" খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সকলে তাহাকে "পাঠক-মহারাজ" বলিত। তাহার কারণও ছিল। সে সকলেরই প্রিয়—নিরীহ, ধর্ম্ম-ভীরু, কোমল-হৃদয়, পঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ; পূজা পাঠে রত, কিন্তু বেজায় বোকা। তাহার বোকামীও অনেক সময় আনন্দদায়ক হইত। তাহাকে শিশুরাও ভালবাসিত।

পাঠক-মহারাজ নামমাত্র দরওয়ান ছিলেন ; অর্থাৎ, নিজেই সর্ব্বদা দরওয়ান সাজিয়া থাকিতেন। আসল দরওয়ানের কাজ অপরের দ্বারা হইত। তিনি নাগরা জুতায়, অর্দ্ধমলিন সাদা থান কাপড়ে, অপেক্ষাকৃত সিতপ্রভাবিশিষ্ট ফতুয়ায়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ও উষ্ণীষস্পর্দ্ধী হাতে-বাঁধা শ্বেত পাগড়ীতে সজ্জিত হইয়া গেটের নিকট একটা টুলের উপর ছেলেদের লইয়া নিয়ত বসিয়া থাকিতেন। সেখানে তাঁহার অপর কাজ ছিল—নিতা-কার সংবাদপত্র ও অন্যান্য ডাক লওয়া। ডাক লইয়া তিনি কাকামহাশয়ের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতেন। ইহা ভিন্ন বাহিরের ডাক লইয়া যাইতেন ; কাহাকেও ডাকিতে হইলে ডাকিতে যাইতেন। এই সকল শ্রমসাধ্য কাজ ছাড়া তাঁহাকে আর বড় একটা কিছু করিতে দেখি নাই। তিনি যে এক কড়া বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন না, ইহা পিতৃব্যমহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। সেই জন্য পাঠক-মহারাজের পক্ষে দ্বারবানের ন্যায় উচ্চ পদলাভ আশ্চর্য্যের কথা হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, কাকামহাশয় লোকটিকে পছন্দ করিয়াছিলেন ; বুঝি তাহার ভিতরটা ভাল ছিল জানিয়া তাহাকে কোনরূপে একটা যোড়া-তাড়া কাজ দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্ট রাখাল, এহেন পাঠক-মহারাজের নিয়োগের দুরূহ কারণতত্ত্ব ভেদ করিবার জন্য অনেক মাথা ঘামাইয়াছিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক দিন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আমাকে সাধু ভাষায় বলিয়াছিল, "বুঝিয়াছি, ইহা শ্বশুর মহাশয়ের তাঁহার শ্বশ্রূর প্রতি প্রীতির

ফল।” কথাটার তখন টীকা ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় আমি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলাম। রাখাল বলিল, “আরে জান না, তোমার কাকার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বলেন, ‘আহা! পাঠক যথার্থই ভক্তিমান ব্রাহ্মণ।’ কাজেই পাঠক আর যান কোথা?”

পাঠক-মহারাজ একদিন পূজায় বসিয়া গীতার একাদশ-অধ্যায়োক্ত অমৃতনিঃস্যন্দিনী স্তোত্রমালা ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত বুঝিতেন মাথামুণ্ডু, এমন কি, দেবনাগরও বুঝি ভাল চিনিতেন না। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস-বশতঃ তাঁহার আবৃত্তি মন্দ হইত না। তাহাতে আবার ভক্তির উচ্ছ্বাস সে শ্লোকগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। আমি তাহা শুনিতে শুনিতে “আনন্দমঠে”র পাণ্ডুলিপি লুকাইয়া পড়িব বলিয়া কাকার বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম। সে দিন বোধ হয় রবিবার ছিল। সে সময় কাকা ভিতরে থাকেন বলিয়া আমি বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম। তখন পাঠক-মহা-রাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

এমন সময় আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কোচে শুইয়া আছেন, তাঁহার উভয় চক্ষু মুদ্রিত, মুখ-সংলগ্ন সট্‌কার নল নিঃশব্দ, তিনি যুক্তকর বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ব্রাহ্মণোচ্চারিত স্তব শুনিতেছেন। মুখে অদ্ভুতভাব ;—কি সুন্দর, কি পবিত্র! আমি সভয়ে, সসম্ভ্রমে পিছাইয়া বাহিরে আসিলাম। সেই দৃশ্যে—সেই দৃশ্যে কেন, তাহার পূর্ব্বের ও পরের ঐরূপ কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনাতেও আমি অল্প বয়সেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কাকার ভিতরে একটা প্রবল ভক্তিস্রোত গিরিনিরুদ্ধকল্লোলিনীবৎ প্রচ্ছন্ন আছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সময়ে বেগরোধকারী শিলা স্থানচ্যুত হইলে ঐ পূত-স্রোত কি তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিবে! পরে সে স্রোত পথ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু হায়! নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই সহসা কালের অনন্ত সাগর-সঙ্গম দেখিতে পাইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। বুঝি তেমন করিয়া তাহার সকল তরঙ্গগুলি তট-

প্রহত করিয়া খেলিবার অবসর পায় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রেমধর্ম্ম-প্লাবিত সমগ্র বঙ্গভূমিতে আজি আবার ভগবদ্ভক্তির বান ডাকিত।

রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নীচের বৈঠকখানার হলঘরে কাকা মহাশয়ের বন্ধুবর্গ সমবেত থাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া যাইলে, কাকাও উপরে যাইতেন। তখন রাখালচন্দ্র ও আমি নির্ভয়ে গল্প-গুজব করিতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মহারাজেরও স্ফূর্ত্তি আসিত। কারণ, তিনি কাকাকে ব্যাঘ্রবৎ ভয় করিতেন। কাকা উপরে যাইলে তিনি ফটকের কাছে একখানি খাটিয়া পাড়িতেন। তাঁহার একটি জীর্ণ দপ্তর ছিল। তাহার ভিতরে অনেক অমূল্যরত্ন—তুলসীদাসের রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি—তিনি শুধু গুছাইয়া রাখিতেন। খাটিয়া পাড়িয়া সেই দপ্তরটি লইয়া তিনি প্রত্যহ পাঠে বসিতেন। পাঠ অবশ্য সুর করিয়াই হইত। শ্রোতা ছিল মেথা সহিস (কোচম্যান মুসলমান ছিল বলিয়া আসিত না) এবং জনৈক পশ্চিমা ফুলুরী-বিক্রেতা। সে ঐ সময় ঠিক আসিয়া জুটিত। কখনও কখনও তাহার সঙ্গে এক বিপুল-দেহ-ভারাক্রান্তা ঘনঘোর কৃষ্ণাঙ্গিনী আসিয়া হরিগাথা শ্রবণ করিতেন। এই কৃষ্ণাঙ্গিনীকে দেখিলেই রাখালের হাসির উৎস খুলিয়া যাইত, তাঁহার সম্বন্ধে তখন অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্যে হাসিতে হাসিতে আমার পেট ব্যথা হইয়া উঠিত। একদিন পাঠ হইতেছে। পাঠক মহারাজ পুস্তক-লিখিত কোন কথাই পাঠকালীন একেবারে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে প্রায় প্রত্যেক

কথাই কষ্টে বানান করিয়া পড়িতে হইত; তাহাতে শ্রোতা-দিগের অর্থবোধ হওয়া দূরে থাকুক, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু "মহারাজে"র ভয়ে কেহই উঠিয়া যাইতে পারিত না। "মহা-রাজ" বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রামায়ণ-পাঠ শুনিতে শুনিতে উঠিয়া যাইলে মহাবীর কুপিত হন, আর তাঁহার ক্রোধ হইলে কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ হয় না; পরন্তু রামায়ণ-পাঠ শুনিলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। এখন, বেচারা মেঘার বড়ই অর্থকষ্ট ছিল; পঞ্চাশৎ-পরায়ণ ফুলুরীওয়ালারও তখন পর্য্যন্ত পুত্র-মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজেই তাহারা প্রাণপাত করিয়া পাঠ শুনিত। কিন্তু এ দিন বড়ই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। পাঠক মহারাজ বহু বিলম্বে এক একটি শব্দের বানান নিষ্পন্ন করিতেছিলেন; সম্ভবতঃ তাহা শ্রোতাদিগের একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই অল্পবয়স্ক যুবক মেঘা সহিসের ঢুলুনি আসিতেছিল; তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ঘুমাইবার জন্য গালি পাড়িতেছিল; কিন্তু ব্রহ্ম-বাক্যে তাহার অটল আস্থাবশতঃ সে তখনও কোনরূপে বসিয়া-ছিল। পাঠক-মহারাজ পড়িবার অগ্রে বানান করিতেছিলেন,—

"প-প-প; র-র; পর-ম, ম; পরম—ইত্যাদি।"

"মহারাজ" এইরূপ বানান করিতেছিলেন, এবং এক এক-বার "আরে মেঘুয়া!" বলিয়া নিদ্রালু মেঘাকে শাসাইতে-ছিলেন। তদুত্তরে মেঘা প্রতিবারেই চমকিয়া উঠিয়া "শুন্‌তেহেঁ মহারাজ!" কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই নিদ্রা-প্রভাবে আবার নতশির হইতেছিল।

উক্ত প্রকারে বানান করিয়া পাঠক যখন সম্পূর্ণ একটি ছত্র বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি উহা হাঁকিয়া পড়িলেন। সেটা যেন তাঁহার বানানরূপ শত্রুজয়োল্লাসজনিত সিংহনাদ বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হইল। হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথা ও শরীর দুলিয়া উঠিল ; তিনি সোৎসাহে পড়িতে লাগিলেন,—

"পরম প্রেম নেহি যাতি।"

সেই সময় অভাগা মেঘার সমুদয় মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছিল। পাঠক-মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বিরক্ত হইয়া পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং মেঘাকে যে শীঘ্র উৎসন্ন যাইতে হইবে, দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। "ভকত" ফুলুরীওয়ালাও তাহাতে যোগদান করিল। তখন মেঘা ভয়বিহ্বলচিত্তে ব্রাহ্মণের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। প্রসন্ন হইয়া শেষে পাঠকমহারাজ মহাবীরের কৃপা লাভের ব্যবস্থা করিলেন ; মেঘাকে ভোগাদির খরচ বাবদ ১।০ দিতে হইবে। মেঘা অগত্যা অবনতমস্তকে স্বীকৃত হইল। সেদিন আর পাঠ হইল না। পরে শুভদিনে, শুভক্ষণে, একদিন পাঠক মহারাজ মহাবীরের পূজা করিয়া ভোগ লাগাইলেন। প্রসাদে পুরী ও মালপুয়ার বাহুল্য ছিল। "জামাইবাবু" এবং আমিও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু ১।০ খরচেও যে মেঘার প্রতি মহাবীর প্রসন্ন হইলেন না, তাহার আর্থিক কষ্ট ঘুচিল না, বরং তাহা অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল, তজ্জন্য মেঘাকে বহুদিন পরেও দুঃখ করিতে শুনিয়াছি !

একদিন কাকার বাসায় সাহিত্যিকদিগের সান্ধ্য-সম্মিলন হইয়াছিল। সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, "বান্ধবে"র কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সিংহ-ব্যাঘ্র সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। যথাকালে সকলে খাইতে বসিলেন। তখন কালীপ্রসন্ন বাবু "বঙ্গদর্শনে" পিতৃদেব-লিখিত "বৈজিক-তত্ত্ব" সম্বন্ধে পিতার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাহাতে যোগ দিলেন। শেষে তিনি বরফ চাহিলেন। তখন কিন্তু বরফের ঠিক সময় নহে। সেটা ফাল্গুন মাস ছিল, বোধ হয়। কাজেই বরফের যোগাড় ছিল না। যাহা হউক, বরফ তখনই আমান গেল, কিন্তু রাখাল ও আমি কাকামহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলাম। কাকা বলিতেছেন,—"এখনকার ছেলেগুলা মানুষ নয়, রাখাল ত কেবল কথা শিখিয়াছে, আর যতীশ যেন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে ; কাজেই উহাদের এ সব দেখিবার আবশ্যক হয় না।" বলা বাহুল্য যে, রাখাল ও আমি উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলাম ; গতিক দেখিয়া নীরবে আমি সরিয়া পড়িলাম। রাখাল কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি সব পেট ভরিয়া শুনিল। খাওয়া দাওয়া চুকিলে সে গজেন্দ্রগমনে আমার কাছে আসিয়া Hamletএর Soliloquy আওড়াইতে আরম্ভ করিল। শুনিয়াই আমি বুঝিলাম, সে একটা কি মতলব আঁটিয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, "খবরদার।" সে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিল, "রেখে দাও

তোমার খবরদার ; রাখাল বাঁড়ুয্যেকে রাগান সহজ কথা নহে—old man কি দেখেন না, আমি কি করি।"

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।' যেমন রাখালচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ করিবার উপায় উপস্থিত ; পাঠক-মহারাজ সহসা আমাদের নিকট সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, "কিয়া খবর মহারাজ!"

পাঠক। এহি বাবু, বাড়ীকা খবর বহুৎ রোজসে নেহি মিলি।

রাখাল। মিলা নাই কেন ?

পাঠক। আরে কিয়া জানে বাবু, চিট্‌ঠি লিখ্‌তা তো, লেকেন্ জবাব নেহি মিলতা।

রাখাল। তা, তার কর না কেন ?

পাঠক। আরে বাবু, গরীব আদ্‌মী—পয়সা কাঁহা মিলি ?

রাখাল। তা বাড়ীর কি খবরের জন্য এত ব্যস্ত ?

পাঠক। হামারা মুলুক্‌মে বহুৎ রোজসে পানি নেহি ভ্যায়া ; গঁহু ভুট্টা সব্ একদম্ জল্ গেয়া, খানা বেগর্ সব্ আদ্‌মী মর্‌তা।

রাখাল। উপায় ?

পাঠক। ওহি এক্ হ্যায়—কি হামারা চাচেরা ভাইকা ঘর্‌মে গঁহু বহুৎ মৌজুদ্ হ্যায়। ও আগর্ হামারা বালবাচ্ছাকো খেলায় তো সব জিয়েগা নেহি তো—

বলিতে বলিতে পাঠক-মহারাজের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

রাখাল। তা খিলাবে বৈ কি। তবে ভাবনা নেই।

পাঠক। এহি লিয়ে তো হাম্ উন্‌কো দোঠো খৎ ভেজা, মগর জবাব্ নেহি মিলা ; কেয়া জানে, ভাইয়া কাঁহা রোজগার খাতির চলা গিয়া হোগা।

এই সময় রাখাল ভায়া যেন একটু চিন্তিত হইল। একটু পরেই তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, একটা বেশ কিছু মতলব তাহার মাথায় আসিয়াছে। তখন রাখাল বলিল, "তা, ও সব খবর জানা ত কোনও শক্ত কথা নয়। ও ত তুমি কর্ত্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জান্‌তে পার।"

পাঠক। কেয়সে বাবুসাহেব ? কর্ত্তাবাবুকা হামারা ঘর্‌কা বাত্ কেয়সে মালুম হোয়েগা ?

রাখাল হাসিয়া উত্তর করিল, "আরে মহারাজ, তুমি কেবল পূজা-পাঠ কর, এ সহজ কথাটা আর বোঝ না ? কর্ত্তাবাবুর কাছে কত বড় বড় খবরের কাগজ আসে, দেখেছ ত ?"

পাঠক। হাঁ, হাঁ, আতা তো, হাম তো ও সব কর্ত্তাবাবুকা টেবিল্ পর্ রাখ্‌তা হ্যায়।

রাখাল। তাতে দুনিয়ার সব খবর লেখা থাকে জান না ?

পাঠক। তব্ কিয়া হামারা ঘর্‌কা খবর ভি উস্‌মে লিখা রহ্‌তা ?

রাখাল। নয় ত কি ? তোমার বাড়ী কি দুনিয়া ছাড়া ?

পাঠক একটু ভাবিল—কথা ত ঠিক বটে ; তাহার বাড়ী ত দুনিয়া-ছাড়া নহে। সে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ

বাবু, হামারা ঘর্‌কা খবর কোন্ কাগজমে লিখ্ সক্‌তা বোলিয়ে, হাম ও কাগজ আপ্‌কা পাস পহিলেই লে আওয়েগা।

রাখাল। না মহারাজ, তা ক'রো না। তা হ'লে কর্ত্তাবাবু গোসা হবেন।

পাঠক। তব্ কর্ত্তাবাবুকো পড়া হো যানেসে আপ্‌না পাস হাম ও কাগজ লে আওয়েঙ্গে ?

রাখাল। না, তাও না। কোন্ কাগজে কবে তোমার দেশের বাড়ীর কথা লেখা থাকে, তার ঠিকানা নেই; দশখানা পড়্‌তে পড়্‌তে একখানায় হয় ত পাওয়া যেতে পারে। আর, যে সব কাগজ রোজ পড়ে, সেই জানে, কোথায় কোন দেশের খবর থাকে; সে যেমন দরকার হলে বার কর্‌তে পারে, অন্যে তেমন পারে না।

পাঠক। আরে জামাইবাবু! তব্ হামারা কিয়া উপায় হোয়েগা ?

রাখাল। উপায় ত বল্‌লুম। কর্ত্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা করো। তিনি যখন কাল সকালে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়্‌বেন, তখন জিজ্ঞাসা করো। আর দেখ, জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি গোসা হবেন, তোমাকে ধমক দেবেন, বক্‌বেন। কারণ, তাঁকে অনেক খুঁজে দেখে বল্‌তে হবে; তা তুমি ভয় পেও না, আর কিছু-তেই ছেড় না। নেহাৎ তখন না বলেন, অন্য দিন এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিও। সে দিন না বলেন, আর এক দিন ধরে পড়ো।

পাঠক। বহুৎ আচ্ছা, বাবু।

রাখাল। আর দেখ, আমি যে এ কথা বলেছি, তা কর্ত্তা বাবুকে কিছুতেই বলো না; বল্‌লে তোমার চাকরী টুট্‌বে। বুঝলে ত?

পাঠক। আরে বা জামাইবাবু! হাম কিয়া বোকা হায়?

তখন আমি হাসিতে হাসিতে রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, "পাঠক, তুমি কর্ত্তাবাবুর কাছে যেও না! খবরের কাগজে তোমার বাড়ীর কোনও কথা লেখে না। মিথ্যা কথা।"

কিন্তু পাঠককে সে কথা বুঝান আমার সাধ্য কি! "জামাই-বাবু"র উপর তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। আর "জামাইবাবু"কে সে তাহার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিত। তদ্ভিন্ন "জামাই-বাবু" মধ্যে মধ্যে মহাবীরের পূজা বলিয়া পাঠককে টাকাটা সিকাটাও দিতেন।

তখন রাখাল বলিল, "যতীশের ও কথা শুনো না, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিলেও শুনো না। আর, এ কথা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেও এস না। এস যদি, ভাল হবে না।" রাখালের উদ্দেশ্য, সে কোনও রকমে ধরা না পড়ে। তখন পাঠক-মহারাজ চলিয়া গেলে আমি রাখালকে বলিলাম, "রসো, আমি তোমার নষ্টামী ভাঙ্গছি। আমি এখনই এ কথা বলে দিব।"

তখন রাখাল আমাকে অনুনয় করিয়া একটা বড় কঠিন দিব্য দিল। শেষে বলিল, "ভাই, দুনিয়াটা আনন্দের জায়গা.

যতদিন পা'র, আনন্দ কর। এমন একটা মজায় কি ব্যাঘাত দিতে আছে?"

আমি কাজেই চুপ করিলাম। একটু মজা দেখিবার যে নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না, এমন কথাও বলিতে পারি না।

পরদিন সকালে কাকামহাশয় চা খাইয়া বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় দীনভাবে পাঠক-মহারাজ তাথায় দর্শন দিলেন। কাকা খবরের কাগজ হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন। পাঠক তখন নমস্কার করিলেন। কাকা প্রতি-নমস্কার করিয়া কথঞ্চিৎ বিরক্তি-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিয়া?"

পাঠকের সেই শেখান কথা। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেশে দুর্ভিক্ষ, বাড়ীর কোনও সংবাদ চিঠি লিখিলেও তিনি পান না। তা কাগজে তাঁহার বাড়ীর কথা কি লেখে, তাহাই তাঁহার জিজ্ঞাস্য।

বৌবাজার দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেনের বলাইচাঁদ দত্ত তখন সেখানে বসিয়া একখানা কি কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি আমার বাপখুড়ার বন্ধু ছিলেন। তিনি ত শুনিয়াই একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া অস্থির! কিন্তু কাকা মহাশয়? তাঁহার গম্ভীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া হাতের কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাঠক-মহারাজ ত একেবারে দৌড়!

যদি অপর কেহ হইত, তাহা হইলে বুঝিত যে, ইহার

ভিতর একটা কিছু রহস্ত আছে, নহিলে এমনটা হয় না। কিন্তু কাকা অসঙ্গত কিছু, এমন কি, এরূপ একটা জীবন্ত আহাম্মুকীও, দেখিলে, কখনও কখনও হঠাৎ রাগিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার সে কথা ভাবিবারও অবসর থাকিত না।

যাহা হউক, সেদিন ত গেল। তাহার পরদিন কাকা আফিস হইতে আসিয়াছেন। গাড়ী তখনও গেটে দাঁড়াইয়া আছে। পাঠক যুক্তকরে আবার উপস্থিত; আবার তেমনই চীৎকার, পাঠকের তেমনই পলায়ন!

শেষে আর একদিন, রাত্রিতে সকলে চলিয়া যাইলে, পাঠক বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কাকা সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে বিরক্তি-সহকারে তখনই উপরে উঠিয়া গেলেন।

ভাগ্যবলে তৎপরদিন পাঠকের দেশ হইতে চিঠি আসিল—সব খবর ভাল। পাঠকের মুখে আর হাসি ধরে না। রাখাল ভায়া বলিল, "দেখিলে কেমন? ছেলেদের যেমন জুজুর ভয় দেখায়, তেমনি জুজুর-ভয়—না শুধু ভয় কেন, আস্ত জুজুই—দেখাইয়াছি। এখন বৈঠকখানা হইতে পলাইতে হয়। রাখাল বাঁড়ুয্যের উপর বুঝিয়া সুজিয়া মন্তব্য পাস না করিলেই জুজু আসে।"

ইহার পর পাঠক আর আমাদের বাড়ীতে ছিলেন না।

কাকা মহাশয়ের নভেলে হুঁসো পশ্চিমাদের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠক এবং তাঁহার কদরের অপর দুই এক জনই তাহার উদ্দীপক।

শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"গীতা"র কথা।

—⁂—

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—যেদিন প্রথম বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখন বঙ্কিমবাবু ডেপুটীগিরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুয্যের লেনস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও দুই তিনবার প্রকাশ্য সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-লাভ ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাহা দূর হইতে; আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম—'ছিলাম' কেন বলি, এখনও আছি। যখন স্কুলে পড়ি, সেই অবস্থাতেই ভক্তির পূর্ব্বরাগে হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। অতএব প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমার তখনকার অবস্থা সেক্‌স্‌পীয়র অমর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন;—

Thus, Indian like
* * I adore
The sun, that looks, upon his worshipher
But knows of him no more.

এই ভাবে কত বৎসর কাটিয়াছিল; ইতিমধ্যে আমি কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় প্রবিষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম; এমন সময় ভাগ্যদেবী একদিন আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপনীত করাইলেন।

উপলক্ষ্যটা বলি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা শোভা-বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। লিওটার্ড নামে এক জন আধা-ইংরেজ আধা-ফরাসী সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব ও আমার স্বর্গগত বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। আমিও এক জন ছোটখাট পাণ্ডা ছিলাম। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নাম ছিল—The Bengal Academy of Literature। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবু যাহাতে এই সভার সহিত সংযুক্ত হন, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সম্মতিসংগ্রহরূপ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাই কোনও এক অপরাহ্নে আমি বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন 'যৌবনে যোগিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনিই ছিলেন প্রধান দূত—আমি সহকারিমাত্র।

গোপালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত—কতকটা স্নেহপাত্রও ছিলেন। তিনি তখন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলির সংগ্রহ ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন—বঙ্কিমবাবু ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই উপদূতের কার্য্য করিতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত আমি সাহিত্যিক' বলিয়া পরিচিত হই নাই, যদিও

তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক-রূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কারণ, আমার স্মরণ আছে, ইহার কিছুদিন পরে কোনও বিজ্ঞ সমালোচক নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্রের' সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবজাত শিশু' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইয়া আমরা যথারীতি সংবাদ দেওয়ার পর তাঁহার দ্বিতল কক্ষে নীত হইলাম। আমি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোপালবাবু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্মিতমুখে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, 'সাহিত্যে' আপনার যে 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি।" বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিশেষ সম্মান বোধ করিলাম। আমি বলিলাম, "মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ, সব আপনি পড়েন না কি?" বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, "হাঁ, অনেকই দেখিতে হয় বই কি! কোথায় কোন নূতন লেখকের উদয় হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করি।" প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন যে, আমি শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্রে ওকালতীতে প্রবিষ্ট হইব। তাহাতে তিনি কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে হারাইব।" আমি নির্ব্বন্ধ করিয়া

বলিলাম যে, "তাহা কেন? আমি সাহিত্যচর্চ্চা কিছুতেই ছাড়িব না।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে, Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ, যে উকীলের সাহিত্য-চর্চ্চারূপ দুর্নাম রটে, মক্কেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবুর উপদেশে আমি তখন মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমি কায়ক্লেশে উভয় কূলই বজায় রাখিয়াছি।

এইবার গোপালবাবু নানারূপ ভূমিকা করিয়া আমাদিগের দৌত্য পেশ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কথার আবরণ ভেদ করিয়া, আরম্ভেই আমাদের দৌত্য নামঞ্জুর করিলেন, এবং সাহিত্য-পরিষদ্ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেববাবু জীবিত রহিয়াছেন, তখন আর কেহই Bengal Academy of Literatureএর সভাপতি হইতে পারেন না। সভার কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে, এবং সভার কিছু সফলতা দেখিলে, তিনি সভায় যোগদান করিবেন কি না, স্থির করিবেন। আমাদের দৌত্য এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু প্রতিগমনের পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ

আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ-চরিত্রে" নহে; তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন, এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। আমিও তখন গীতার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তী কালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ, বিশ্বরূপ-দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবুর কথা নিঃসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে পরে আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে আমার এই-রূপ ধারণা হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে। গীতার মর্ম্মান্তিক ঘটনা অর্জ্জুনের মোহ। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলে বিপক্ষ পক্ষে আত্মীয়স্বজন অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনের চিত্তমোহ উপস্থিত হয়, এবং তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে উদ্যত হইয়া করুণস্বরে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তিনি আরও বলেন যে, বরং কৌরবেরা তাঁহাকে নিশিত শরে নিহত করুক, তিনি তাহাদের অঙ্গে অস্ত্রপাত করিবেন না।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥

অর্থাৎ, এই বলিয়া অর্জ্জুন রণস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্তে রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইহারই নাম অর্জ্জুনের মোহ। গীতা ইহার নাম দিয়াছেন "কশ্মল"।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং-বিষমে সমুপস্থিতম্।"

এই কশ্মল হইতেই গীতার আরম্ভ। অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মৌখিক উপদেশে সে মোহ তিরোহিত হইল না, তখন তিনি আপনার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিলেন। এই বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতার একাদশ অধ্যায় নিযুক্ত। সেই বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের মোহ তিরোহিত হইল। তাঁহার পর তিনি বলিলেন :—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

"আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

আমার বিশ্বাস, গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিশ্বরূপ-দর্শনই গীতার মুখ্য ঘটনা ছিল। মহাভারতের আদি পর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে, ইহা সম্ভবতঃ

মূল মহাভারতের সারসংগ্রহ। এই ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের একটি শ্লোক এই ঃ—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে, "যখন শুনিলাম যে, অর্জ্জুন 'কশ্মল'-গ্রস্ত হইয়া 'রথোপস্থে' অবসন্ন হইয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করিতে পারি না।"

ভগবদ্গীতার বক্তা সঞ্জয়ও বলিতেছেন যে, ব্যাসের প্রসাদে তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

"শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণে আসিতেছে, এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষ অনুভব করিতেছি।"

এখানেও বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা। এই বিশ্বরূপ-দর্শনে যাহার মোহ দূর না হয়, তাহাকে সাংখ্যের ত্রিগুণ-তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। অতএব বঙ্কিমবাবু যে গীতার শেষ ছয়

অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতেন, ইহা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক বিশ্বরূপ-দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায়—যাহাতে ভক্তের ও ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে, এবং যাহাকে বঙ্কিমবাবু গীতার মৌলিক অংশ বিবেচনা করিতেন, এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। সেই জন্য ভগবদ্গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।" সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের কি গতি হইবে? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায়েও এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহার ধ্বনি মূল গীতার ধ্বনির অনুরূপ। * আমার মনে হয়, এ সমস্যার পূরণ এই যে, মূল ভগবদ্গীতা (যাহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তাহার অধ্যায় ও শ্লোক-সংস্থান (arrangement) অন্যরূপ ছিল। গীতার বর্ত্তমান আকারে পুনঃ-সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে

* দৃষ্টান্তস্বরূপ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২২—২৭ শ্লোক; ১৫ অধ্যায়ের ৫—৬ ও ১২—১৮ শ্লোক, এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর এ কথা ঠিক যে, বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি।

বঙ্কিমবাবুর কথা বলিতে গিয়া গীতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বসিলাম। কিন্তু ঐদিন বঙ্কিমবাবু গীতার শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা গীতার পাঠক ও সমালোচকবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধী-সমাজে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্ত্তী কালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বঙ্কিমবাবু।

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি—বঙ্কিমবাবু। পরমারাধ্যা জননী দেবীর মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু, অগ্রজদিগের মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু; তাই এই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম—বঙ্কিমবাবু। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেটুকু স্মৃতি, তাহাই জ্ঞাপন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে এ স্মৃতি আমার পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতির সহিত কতক জড়িত।

সম্প্রতি একদিন আমার কোনও বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বঙ্কিমবাবুর রং কি কাল ছিল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাল বলিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমি তাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান, চোগাচাপকান আবৃত চেহারা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার রং কালই বোধ হইয়াছিল।" এরূপ ধারণা হয় ত আরও অনেকের থাকিতে পারে, সেই জন্য প্রথমেই তাঁহার বর্ণের কথা বলিব। তাঁহার গুরুর ভাষায় বলা যাইতে পারে, তাঁহার রং "কষিত কাঞ্চনে"র ন্যায় ছিল। বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে, একদিন বঙ্কিমবাবু আমার পিতৃদেবের সহিত গল্প করিতেছিলেন। দুই জনে দুটি তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ-শায়িত ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর গায়ে একটি পাতলা দুগ্ধফেননিভ লংক্লথের কোট ছিল। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার রং ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার নিজের

উপমা ব্যবহার করিলে বলা যাইতে পারে যে, যথা কাচের ভিতর দিয়া আলো যেমন অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তেমনই তাঁহার রংও সেই কোটের আবরণে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে-ছিল। গোঁফ ও কেশ ঘন ও মিসমিসে কাল। তাঁহার এই সময়ের ফটো আমাদের আছে। বঙ্কিমবাবুর প্রণীত "দীনবন্ধু-জীবনী"র শেষ সংস্করণে ঐ ছবির হাফ্‌টোন প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। "মানসী"তে বোধ হয় এই ছবি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পাঠ্যাবস্থায় যখন বঙ্কিমবাবু ও আমার পিতৃদেব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য ছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহাদের পত্রে আলাপ হয়। পরে তাঁহাদের যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের অবিদিত নহে। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহারা কেবল দুই জনে বসিয়া থাকিতেন, তখন অনেক সময় নীরবে কাটিয়া যাইত। দুই জনে দুইটি গুড়্‌গুড়ি লইয়া ধূম পান করিতেন, এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণও কাটিয়া যাইত। শুনিয়াছি, কারলাইল ও এমারসন্‌ উভয়ের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, দুই জনে দুইটি চুরুটের ধূম বাহির করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহাদের আত্মায় আত্মায় কথা হইতেছিল, বাহ্যেন্দ্রিয়ে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গসাহিত্যের এই দুই মনীষী বন্ধুরও সেইরূপ নীরব কথোপকথন হইত!

আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পরও বঙ্কিমবাবু এই নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিমবাবু স্থির ছিলেন। "বঙ্গদর্শনে" তাঁহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। অনেকেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি "বঙ্গদর্শনে"র বিদায়-গ্রহণে এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন,—

"আমার আর এক জন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী. তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতেছি না। এই 'বঙ্গদর্শনে'র বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই 'বঙ্গদর্শনে' আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই; কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু। আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখন কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না।" এরূপ অতলস্পর্শী সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত আর আছে কি!

তাঁহার আর এক জন প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। ইনি "পণ্ডিতাগ্রণী কাব্যামোদী" ৺জগদীশনাথ রায়। বঙ্কিমবাবু উভয়কে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার কলিকাতার

বৈঠকখানায় তাঁহার পিতৃদেব ও তাঁহার নিজের তৈলচিত্র দেখাইয়া কহিলেন, "ঘরে স্থান নাই, নহিলে কয় ভায়ের. দীনবন্ধু ও জগদীশের ছবি রাখিতাম।" অনেকেই হয় ত জানেন না যে, এই জগদীশবাবুই "বিষবৃক্ষে"র 'হরদেব ঘোষালে' কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশ বাবুর চিঠিপত্র চলিত। এ কথা জগদীশবাবুর পুত্র ভক্তিভাজন বাবু খগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট শুনিয়াছি।

অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বন্ধুত্ব বন্ধুর মৃত্যুর সহিত ফুরাইয়া যায়। আমার পিতৃদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেরই বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর বন্ধুত্ব সে জাতীয় ছিল না। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। সততই আমাদের সংবাদ লইতেন। আবশ্যক হইলে সৎপরামর্শ দান করিতেন। তাঁহার দ্বারা যে উপকারসাধন হইতে পারে, তাহা করিতে কখনই বিরত হয়েন নাই। তিনিই পিতৃদেবের রচনাগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করিতে বলেন, এবং নিজে পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনীও লিখিয়া দেন। ইহা পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি ইহাকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবার অনুমতি দেন, এবং এই জীবনী সে অবধি আমাদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার উপস্বত্বও আমরা ভোগ করিতেছি। মৃত বন্ধুর পুত্রগণের প্রতি এই স্নেহের চিহ্ন অতীব বিরল। তাঁহার ঋণ পরিশোধনীয় নহে। কেহ কেহ বলেন,

অনেক স্থলে ঋণ স্বীকার করা ঋণ-পরিশোধের কতকটা উপায়। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ঋণ স্বীকার করিতেছি। পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার সময়ে তিনি আমাদিগকে একখানি ইংরাজী পত্র পাঠান। তাহার আরম্ভে লিখিয়াছিলেন—"I owe it to the memory of your father that I shouid give a critical estimate of his writings", এবং বিজ্ঞাপনে এ কথা প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সমালোচনার পূর্ব্বাভাস এই পত্রে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি-ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।"

"বঙ্গদর্শনে"র বিদায়গ্রহণ-প্রবন্ধ-পাঠে মনে হয়, তিনি আমার পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক নীরবে বহন করিয়াছিলেন। কাহারও নিকট যে কাঁদিয়াছিলেন, তাহাও শুনি নাই। শোক তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন আমাদের বাটীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহার ক্ষত হৃদয়ের শোকরাশি সেতুবন্ধনে জলসংঘাতের ন্যায় উছলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি

আমাদিগকে দেখিয়া, আমাদের বালিকা সহোদরাকে ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু এখনও আমার হৃদয়ে কল্যকার ঘটনার ন্যায় জাগিয়া আছে। সে দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিব না।

তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চিহ্ন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে "নবীন তপস্বিনী" নাটক উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাকে "মৃণালিনী" উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই, তাহা দেখাইবার জন্য "আনন্দ-মঠে"র অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।" ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন তাঁহার বন্ধু হালামকে ভুলিতে পারেন নাই। কাব্যে ইহার অমর নিদর্শন আছে। যদি বীজের সহিত বৃক্ষের তুলনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, "আনন্দ মঠে"র উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের In Memoriam। শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর আবার সেই দুই বন্ধু পুনরায় মিলিত হইয়াছেন। সে মিলন অনন্ত কালের জন্য, তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। মৃত বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া তিনি যে আপনাকে "ত্বদধীনজীবিতং" বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই সত্য। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ পূর্ণবাবু একদিন আমাকে বলিলেন,—"তোমার

বাবার মৃত্যুর পর বঙ্কিমবাবুর জীবনের পূর্ব্বকার অবস্থা আর দেখি নাই। যেন তাঁর জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুরের প্রণীত "চন্দ্রজিৎ" নামক নাটকের অভিনয়দর্শনকালে একটি কথা বড় মনে লাগিয়াছিল। রাজা 'চন্দ্রজিৎ' বলিতেছেন—"রাজর্ষির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্চে সব মনে রাখা। স্মৃতির প্রত্যেক-টিই সজাগ রাখিলে স্মৃতি-বিলোপনের উপায় সুসাধ্য, নচেৎ কর্ম্মক্ষয়কালীন কোন না কোন লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।" বঙ্কিমবাবু সাহিত্যজগতের রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারও ঐরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল। আমার পরলোকগত বন্ধু ৺শরৎকুমার লাহিড়ী বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরি-চায়ক একটি গল্প করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি ;—একবার বঙ্কিমবাবু "সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত, সকলে বিদিত" রামতনু লাহিড়ী মহাশকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। শরৎবাবু তখন তরুণবয়স্ক। বয়সের চাপল্যনিবন্ধন তিনি বঙ্কিমবাবুর নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার একখানি ফটো চাহেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলেন যে, এক্ষণে তাঁহার আর ফটো নাই ; যদি ভবিষ্যতে কখন আবার ফটো তোলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একখানি দিবেন। ইহার বহু বৎসর পরে যখন কলিকাতায় অবস্থানকালে পুনরায় ফটো তোলেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারী উমাচরণকে বলেন যে, "রামতনুবাবুর পুত্র শরৎকে একবার আসিতে বলিও।" শরৎবাবু তাঁহার পিতৃসুলভ

সরলতার সহিত স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পুস্তকের দোকান তখন বেশ চলিতেছে। তিনি S. K. Lahiri নামেই অভিহিত। তিনি ভাবিলেন, তাঁহাকে প্রকাশক করিবার জন্যই বুঝি বঙ্কিমবাবু ডাকিয়াছেন! তিনি বঙ্কিকবাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরিচয় দিলেন যে, তিনি S. K. Lahiri। বঙ্কিমবাবু শুনিয়া তাঁহাকে কোনও উত্তর না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "উমাচরণ, উমাচরণ, তুমি কাকে ডাকিয়াছ? আমি যে রামতনুবাবুর ছেলে শরৎকে ডাকিতে বলিয়াছিলাম।" শরৎবাবু অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "আমিই শরৎ।" তখন তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণনগরে যখন তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, আমার কাছে ফটো চাহিয়াছিলে;—মনে পড়ে?" শরৎবাবুর সে কথা আদৌ স্মরণ ছিল না, বঙ্কিমবাবু বলিবার পর তাঁহার মনে পড়িল। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, "আমি আবার ফটো তুলিয়েছি, প্রথম উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি।" বঙ্কিমবাবু যে এই সামান্য কথাও বিস্মৃত হন নাই, তাহা দেখিয়া শরৎবাবু চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ সামান্য কথা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতার পরিচয় আমিও একবার পাইয়াছিলাম। University nstituteএ বেদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত হয়। বঙ্কিমবাবুর প্রথম বক্তৃতা আমি শুনিতে গিয়াছিলাম। বহুজনতার জন্য কিছুই শুনিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া দুঃখিত-অন্তঃকরণে চলিয়া আসিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বক্তৃতাটি ছাপা হইবে কি না? তিনি বলিলেন, University Magazineএ ছাপা হইবে। পরে অন্য কথা হইয়াছিল। বক্তৃতাটি পড়িবার জন্য আমার অব্যক্ত আগ্রহ তিনি বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর আমার তৃতীয় অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে যান। আসিবার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "এই Magazineটি তুমি ললিতকে দিও, তাহার আমার বক্তৃতাটি পড়িবার ইচ্ছা আছে।" আমি কাগজ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি যে আমার আগ্রহটি মনে রাখিয়াছেন, তাহাতে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত হইল। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, পড়িয়াছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, অচিরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। সে বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইল না। বঙ্গদেশের কেন, সমস্ত শিক্ষিত-জগতের দুর্ভাগ্য যে, ঐ বক্তৃতা সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। Vedic Literature সম্বন্ধে ইহা যে এক অমূল্য পদার্থ হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইবার তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমোন্নতির অবতারণা করিয়া উপসংহার করিব।

সাহিত্য-জীবনের শৈশবকাল তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'সাহিত্য-পাঠশালা'য় অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার দুই জন সতীর্থ ছিলেন—৺দ্বারিকানাথ অধিকারী ও ৺দীনবন্ধু মিত্র। গুপ্ত কবি ইঁহাদের তিন জনকে বড়ই স্নেহ করিতেন,

এবং সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিতেন। একবার ইঁহাদের তিন জনকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কথনও কথনও কবিতায় কলহ হইত। সে সব কবিতা "কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রভাকর-পাঠে জানা যায় তদানীন্তন লোকে ইঁহাদের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে যুগান্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে আশাও পূর্ণ হইয়াছিল। তবে বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ ৺দ্বারিকানাথ অধিকারী 'নীলদর্পণ' 'দুর্গেশনন্দিনীর' ন্যায় কোনও পুস্তক রচনা করিবার পূর্ব্বেই অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা মুকুলেই শুখাইয়া গেল। অপর দুই জন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ অবলম্বন করিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের আর এক জন সহযোগী ছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যে ও নাট্যে ও উপন্যাসে তাঁহারা এক সময়েই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিন পুণ্য-স্রোতস্বিনীর ন্যায় একত্র যুক্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গমকে সাহিত্যের প্রয়াগতীর্থ বলা যাইতে পারে। যদি বিদেশী উপমা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে, বঙ্গ সাহিত্যের এই দিব্য যুগকে Literary Triumvirate বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মধুসূদন দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র Literary Triumvirs বা সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ ছিলেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎকর্ত্তৃক রচিত একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত করিলাম,—

মহাকবি মাইকেল পুরুষ বিরাট,
হাস্যসিন্ধু দীনবন্ধু দীনের তারণ,
বঙ্কিম মাধুর্য্যমণি কোরকসম্রাট,
একাধারে রাজ্যদণ্ড করিল ধারণ।
ধন্য মাতা বঙ্গভাষা বড় ভাগ্য জোর,
সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ সিংহাসনে তোর।

বঙ্গসাহিত্যের, বঙ্গদেশের, বঙ্গসমাজের, চির আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই ত্রয়াধিপের দুই জন—মধুসূদন ও দীনবন্ধু ১২৮০ সালে, চারিমাস ব্যবধানে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহাদের পরলোক-গমনের পর 'কোরকসম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র একছত্র সম্রাট হইলেন। সম্রাটের কার্য্য—পালন ও শাসন করা। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুই কার্য্যই সম্যকভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বীয় কল্পনাপ্রসূত রচনায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন, তেমনই অপর দিকে সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে সাহিত্যে জঞ্জালের প্রবেশ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ বৎসর যাবৎ সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই পালন ও শাসন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের সব্যসাচী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎকর্ত্তৃক রচিত আর একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব,—

এক হস্তে দিব্য তান বীণার ঝঙ্কার,
অন্য হস্তে শক্তিশেল কঠোর-সন্ধান,

দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিবে মহান্।
সাহিত্যের রাজসূয় তব অনুষ্ঠান,
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ সমাধান।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

'বন্দে মাতরম্'।

'বন্দে মাতরং' রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাইয়াছিলেন। সেই দিন বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে "বঙ্গদর্শনে"র পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, গান যাহাই হউক, বন্দে মাতরং দ্বারা "বঙ্গদর্শনে"র পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, এ গানের মর্ম্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে। মহাঋষির এই ভবিষ্যদ্বাণী যে আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

আজ সোনার বাঙ্গালার কানন প্রান্তর বন্দে মাতরং ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কণ্ঠেই বন্দে মাতরং নিনাদিত। বন্দে মাতরং রবে প্রবাহিণীকুল কল্লোলিত ও গিরিমালা মুখরিত। স্বয়ং শব্দগুণময় অন্তরীক্ষ আজ বন্দে মাতরং মন্ত্রে বিকম্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি পূর্ব্বেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। গত ১৫ই আষাঢ় * যে দিন রথোৎসব উপলক্ষে কলিকাতার "বন্দেমাতরং সম্প্রদায়" বঙ্কিম তীর্থে গমন করেন, সেইদিন সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার নিজের মুখ হইতে এই ঘটনাটি শুনিবারও সুযোগ হইয়াছিল।

অনেকের বিশ্বাস স্বদেশ-প্রতিমার স্তব করিবার জন্য "আনন্দ মঠে" বন্দে মাতরং সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, "আনন্দ-মঠে"র কল্পনার পূর্ব্বে বন্দে মাতরং মন্ত্র উদীরিত হইয়াছিল। স্থিরভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, "আনন্দ-মঠে" বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরং মন্ত্রের কবিত্বময়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপন্যাস-ভাবে দেখিলে আনন্দ-মঠ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে কাব্যাংশে নিকৃষ্ট বলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি এক দিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই।

* ১৩১৪ সাল ?

কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহার কোন্ উপন্যাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট? তিনি বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, এবং নূতন সংস্করণের রাজসিংহ। আনন্দ-মঠের উল্লেখ না শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমাবধি আমি আনন্দ-মঠের পক্ষপাতী। হয় ত আনন্দ-মঠের উৎসর্গের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্নসৌহৃদ" আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি জড়িত থাকা—পক্ষপাতের অন্যতম কারণ। আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম যে, "as a patriotic work আনন্দ-মঠ অতুলনীয়।" তিনি বলিলেন, "ও senseএ খুব ভাল বটে, কিন্তু উহাতে art কম।" আনন্দমঠ উদ্দেশ্যমূলক হইলেও আমরা বলিতে পারি যে, বন্দে মাতরং মন্ত্র ইহাকে মাধুর্য্যময় ও পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে।

আর একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আদেশ ছিল, যেন তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী অপ্রকাশিত থাকে। আজ দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি সাহিত্য-জগতের একছত্র অধিপতি বলিয়া সম্মানিত ও আদৃত হইতেন; কিন্তু আজ তিনি বন্দে মাতরং মন্ত্রের ঋষি বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। কে বলিতে পারে, তাহার আদেশবাণী বর্ত্তমান যুগবিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে?

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে একটী বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার প্রায় সকল পুস্তকেই সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় "দুর্গেশনন্দিনী"তে অভিরাম স্বামী, "মৃণালিনী"তে মাধবাচার্য্য, "কপালকুণ্ডলা"য় কাপালিক, "বিষবৃক্ষে" ব্রহ্মচারী, "চন্দ্রশেখরে" রামানন্দ স্বামী, "আনন্দমঠে" চিকিৎসক, "দেবী চৌধুরাণী"তে ভবানী পাঠক, "সীতারামে" গঙ্গাধর স্বামী প্রভৃতির ক্ষমতার নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি। "রজনী"তে অন্ধ রজনীর সাধু কর্ত্তৃক অন্ধত্বমোচন হইয়াছিল, এবং "আনন্দ-মঠে" সর্পদংশনে মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত কল্যাণীর শিশু সন্তানের পুনর্জীবনলাভ হইয়াছিল। মনঃক্ষেত্রেও ইহার সুফল দেখিতে পাওয়া যায়;—মহাপুরুষের চিকিৎসায় শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী উজানবাহিনী হইয়াছিল।

এক ব্যক্তির রচনায় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্যের বিবিধ বর্ণনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, এবং স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—বঙ্কিমচন্দ্র কেন এইরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার স্বীয় পরিবারমধ্যে সাধুপুরুষের যে অলৌকিক নিদর্শন ছিল, তাহাই ইহার কারণ-বলিয়া অনুভূত হয়। সেই অলৌকিক ঘটনা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবৃত করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য:

নৈহাটী অঞ্চলে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মপ্রবণতা ও শিষ্টাচারের জন্য বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। একদা তাঁহার পিতা

কোন শুচিতা-বিবর্জ্জিত আচরণের জন্য স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েন। অভিমানে ও ক্ষোভে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাজপুরে স্বীয় অগ্রজের নিকট গমন করেন। তাঁহার অগ্রজ তথায় নিমকী-সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দূরপ্রবাসে ভ্রাতাকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং দুই সহোদরে সন্তোষের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তার-পর কনিষ্ঠ সহোদর যাদবচন্দ্র বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার কর্ণমূল স্ফীত হইল। ব্যাধি ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল, এবং সেই রোগেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎকালে নৈহাটী অঞ্চলের প্রথিতনামা চিকিৎ-সক বৈদ্যনাথ কবিরাজ মহাশয় যাজপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তিনিই যাদবচন্দ্রের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বড়ই কাতর হইলেন, কিন্তু শোকশেল বক্ষে বহন করিয়াও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। যথাসময়ে যাদবচন্দ্রের শবদেহ বৈতরণীর কূলে আনীত হইল। শবের সংকারের জন্য চিতা সজ্জিত হইতে লাগিল। যে সকল বন্ধু শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিষণ্ণবদনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধূলা-লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। শবদেহ শুভ্র চাদরে আবৃত ছিল। এমন সময় সেই শ্মশানক্ষেত্রে এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

মহাপুরুষ শবের নিকট গমন করিয়া শব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাদবচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। কষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার কান্তি ছিল। সে অবস্থাতেও তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য বস্ত্রভেদ করিয়া বিকশিত হইতেছিল। অগ্রজ মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া সকল বিষয় তাঁহার গোচর করিলেন। মহাপুরুষ যুবকের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার শবদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, যুবক জীবিত আছে, এবং তাহার দেহের উপর কর সঞ্চালন করিয়া তাহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সকলের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া সেই চিরাশায়িত দেহ পুনর্জীবিত হইল!

পুনর্জীবিত হইয়া যাদবচন্দ্র দুই হস্তে মহাপুরুষের পাদদ্বয় বেষ্টন করিয়া তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার গুরু হইতে স্বীকৃত হইলেন। শ্মশানক্ষেত্র দীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হইল। দীক্ষান্তে যাদবচন্দ্র মহাপুরুষের অনুগমন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন। কিন্তু মহাপুরুষ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার হয় নাই; তোমার সংসারে অনেক কাজ আছে, তুমি গৃহে প্রতিগমন কর।" যাদবচন্দ্র অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন কারতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু গুরুদেবের নিদর্শন রাখিবার ইচ্ছা তদীয় চরণে নিবেদন করিলেন। গুরু যাদবচন্দ্রকে স্বীয় খড়ম ও পৈতা প্রদান করিলেন। ভক্ত শিষ্য ইহাতে ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেবের

পুনর্দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করিলে, মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তিনবার আমার দর্শন পাইবে।" কোথায়, কিংবা কবে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই; তবে বলিয়াছিলেন, "শেষ দর্শন তোমার মৃত্যুর সময় হইবে।" মহাপুরুষ যাদবচন্দ্রকে আরও কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সম্মানসূচক কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার চারিটি পুত্রসন্তান হইবে; সকলেই তাঁহার ন্যায় সম্মানসূচক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন কর্ত্তৃক তাঁহার বংশ চিরকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিত হইবে। পরিশেষে তিনি প্রপৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিবেন। এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। যাদবচন্দ্র বৈতরণীর উপকূল ত্যাগ করিয়া জাহ্নবীর উপকূলে আগমন করিলেন।

যথাকালে যাদবচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল, এবং তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ডেপুটী কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন। যখন তিনি ডেপুটীপদে নিযুক্ত, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাদের দুইবার দর্শন দেন। প্রথম, মেদিনীপুরে; এবং দ্বিতীয়বার বর্দ্ধমানে। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর যাদবচন্দ্র কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পেন্‌সন ভোগ করেন। কালে তাঁহার চারিটি পুত্রসন্তান হয়;—প্রথম, শ্যামাচরণ; দ্বিতীয়, সঞ্জীবচন্দ্র; তৃতীয়, বঙ্কিমচন্দ্র; এবং কনিষ্ঠ, পূর্ণচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুত্রগণের কর্ম্ম সম্বন্ধে

মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী যে সত্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে তাঁহার বংশ-গৌরবের কথা উল্লেখ করিব। মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক জন পুত্র কর্তৃক তাঁহার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। আজ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে মুখরিত ভারত ভূমিতে ঐ ভবিষ্যৎবাণীর সার্থকতা সপ্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন, সাহিত্যসম্রাট ও "বন্দে মাতারম্" মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের বংশ যাবচ্চন্দ্রদিবাকর আর্য্যাবর্ত্তে স্মরণীয় থাকিবে।

যাদবচন্দ্র পেন্সন গ্রহণ করিয়া কাঁঠালপাড়ার ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকবৎসর পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন, এবং গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পত্নীর পরলোকগমনের পর যাদবচন্দ্র একবার তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের মন্দিরে রাধাবল্লভের মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রাধা-বল্লভের রথোৎসব হইত, এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বেশ প্রদর্শিত হইত, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। রাধা-বল্লভের উপাসক যাদচন্দ্রের জয়পুর ও বৃন্দাবন বড়ই আদরের তীর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি গোবিন্দজীর মূর্ত্তি দর্শনান্তে এক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রাধাবল্লভ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া

বলিতেছেন, "আমি কি এখানেই আছি ?—সেখানে নাই ?" এ ঘটনায় তিনি বড় বিচলিত হয়েন, এবং তীর্থদর্শনাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া রাধাবল্লভের প্রাঙ্গনে শিশুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া রোদন করেন। অতঃপর তিনি আর কোনও তীর্থে গমন করেন নাই। এমন কি, পবিত্রসলিলা সুরধনী ভবনের উপকণ্ঠবাহিনী হইলেও, সেই পুণ্য প্রবাহেও কখনও অবগাহন করেন নাই।

পুত্র-পৌত্র বেষ্টিত হইয়া সুখে দিনপাত করিতে করিতে মৃত্যুর ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল। তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন। পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া সকলে অনুমান করিলেন, এবং অন্তিম-কালে তাঁহাকে তীরস্থ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির করা হইল তখনও তাঁহার জ্ঞানালোক একেবারে অস্তমিত হয় নাই ; তিনি পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাকে গঙ্গাভিমুখে কেন লইয়া যাইতেছ ? রাধাবল্লভের মন্দিরে লইয়া চল, এবং যতক্ষণ জীবিত থাকি, রাধাবল্লভের চরণতলে রাখিয়া দিও।" তাঁহার আদেশমত কার্য্য করা হইলে, তিনি রাধাবল্লভের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দরবিগলিতধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। শিশু যেমন পিতার নিকট আবদার করে, সেইরূপ করিয়াছিলেন। অনেক কথা বলিয়াছিলেন, এবং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে বঙ্কিমকে একটি পুত্র সন্তান দিলেন না। তিনি তীরস্থ হইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু গ্রামস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ জানাইলেন যে তীরস্থ হইতে অসম্মত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রগণকে কলঙ্ক

স্পর্শ করিবে। তখন তিনি স্বীকৃত হইলেন। পীড়ার সময় প্রলাপে বলিয়াছিলেন, "আমি এমনই পাষণ্ড যে, আমার গুরুদেব আসিলেন আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না" এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব আসিয়াছিলেন কি না জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইলেন, এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, তাঁহার পীড়ার পূর্ব্বে এক জন সাধুবেশধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় আরও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, এবং যাদবচন্দ্র প্রপৌত্র-মুখদর্শনে বঞ্চিত হন নাই। যথাসময়ে তিনি পুত্র পৌত্র ও আত্মীয়গণে বেষ্টিত হইয়া জাহ্নবীর পুণ্য-সৈকতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার পরলোকগমনে সকলেই দেখিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব, বৈতরণী সৈকতে আবির্ভূত সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী ছত্রে ছত্রে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

অতঃপর খড়ম ও পৈতার কথা কিছু বলিব। যাদবচন্দ্র খড়ম ও পৈতা অতিশয় যত্ন ও ভক্তির সহিত রক্ষা করিতেন। পুত্রগণের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি যেমন ভক্তির সহিত উহা রাখিয়াছেন, যদি তাঁহারা উহা সেইরূপে রাখিতে সাহস করেন, তাহা হইলে তাহা রাখিবেন, নচেৎ তাঁহার মৃত্যুর পর জিনিস দুটি গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিবেন। পিতার পরলোকগমনের পর দ্রব্য দুটি রাখিতে পুত্রগণের ভরসা না হওয়ায়, উহা গঙ্গার নির্ম্মল নীরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যজ্ঞোপবী-

তের সূত্র নেপালের বৃক্ষবিশেষের আঁশে প্রস্তুত। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, যাদবচন্দ্রের গুরু মহাপুরুষের আবাসক্ষেত্র নেপাল।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী রচনা সকলে সেই ধর্ম্মভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, সকলই ধর্ম্মমূলক। দেবীচৌধুরাণীর উৎসর্গপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সেই ধর্ম্মজীবনের আভাসে বলিয়াছেন,—তাঁহার কাছেই প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন। ইহা স্বরূপ বর্ণনা, কণামাত্র রঞ্জিত নহে। আসুন আমরা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম করি।

বঙ্কিম-স্মৃতি।

সেদিনকার কথা বলিয়া মনে হইলেও দেখিতে দেখিতে চল্লিশ বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে। যখন বঙ্কিম-চন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তখন আমার বয়স ষোল সতের বৎসর হইবে। আমাদের গ্রামে ভট্টাচার্য্য পল্লীর কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহের মকর্দ্দমা। ভিন্নজাতীয়া এক কন্যার সঙ্গে ঐ ভট্টাচার্য্যবংশীয় কালীনাথের বিবাহের ঘটক ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে জাতি ও ধর্ম্মনাশের মকর্দ্দমা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারাসতের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ে উপর্যুক্ত ঘটনায় সংসৃষ্ট আসামীদের বিচার হয়। আমরা গ্রামের বহুসংখ্যক বালক সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম।

বারাসতের আদালতগৃহ উদ্যান-পরিবেষ্টিত এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারাসত জেলা ছিল, এবং মহকুমায় পরিণত হইবার সময়ে দেশবিশ্রুত স্যর আশ্‌লি ইডেন এখানকার প্রথম মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বহু বহু প্রধান ব্যক্তির পদার্পণে সেকালে বারাসত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার, মদন-মোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এখানে জেলা-স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র সহোদরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-

পত্তিসূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সর্ব্বদাই তাঁহাদের সঙ্গসুখ-সম্ভোগের লোভে বারাসতে যাতায়াত করিতেন। সেকালে সমগ্র বঙ্গের মধ্যে বারাসত কলিকাতার নিকটে একটী প্রধান স্থান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বহু বহু সাধুগণের পদরজঃ-স্পর্শে পূত তীর্থস্থানে বিচারাসনে যখন উপবিষ্ট, তখনই তাঁহার সেই সর্ব্বজন-লোভনীয় সৌন্দর্য্যের লীলা-বিলাস-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদা ঋষিরা রাম-রূপে মুগ্ধ হইয়া রামের পুরুষকান্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি সেদিন কালী-নাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়া সেই যে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্য্যের তেমন বিজলী-লীলা আর কখনও কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য্য ও চুঁচুড়ার ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি, তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। জনসমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য্য দেখি-য়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্য্য-রাশিও বিরল বটে। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র, বীরেন্দ্রনাথও সুপুরুষ। কিন্তু যেন মনে হয়, মেয়েলী ঢংএর রূপরাশি তাঁর চারিদিক আলো করে। কিন্তু বঙ্কিমের সে সিংহ-বিক্রম-বিমণ্ডিত পৌরষভাবময় সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে রূপের দেমাক্ বড়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভয়ানক দেমাকে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই সে

অহঙ্কারের কিয়দংশ বোধ হয় তাঁহার পুরুষোচিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহের অহঙ্কার। 'বোধ হয়'—বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উত্তরকালে তাঁহার নিকট, (অন্যদীয় সাহায্য ব্যতিরেকে) পরিচিত হইবার সময়ে বা তৎপরে কখনও তাঁহার অহঙ্কারের পরিচয় পাই নাই। তিনি সর্ব্বদা সরল লোকের ন্যায় সহজ ব্যবহারই করিতেন। হইতে পারে, হয় ত বা আমি তাঁহার অহঙ্কার-প্রদর্শনের যোগ্য পাত্র ছিলাম না।

দেখিতে গিয়াছিলাম বিবাহ-বিচার, কিন্তু সে সব ভুলিয়া দেখিয়াছিলাম—নয়ন ভরিয়া পরমানন্দে দেখিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবুকে। আমার দ্বিগুণ বয়সের বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর আমি তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সের বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাঠক হয় ত বলিবেন, আমি রসজ্ঞ বালক ছিলাম। কিন্তু সে কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন দেখি না ; কারণ, এক বৎসর বয়স্ক বালকও ফুলের শোভায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমিও তেমনই বঙ্কিম-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন আদালতে বহু উকীল মোক্তার উপস্থিত ছিলেন ; পক্ষাপক্ষ আমলা ও অসংখ্য দর্শকে আদালতগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল : সেই জনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাজাসনে উপবিষ্ট রাজযোগ্য-শোভামণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া একটী রূপবান পুরুষ, অথবা স্বর্গচ্যুত বিদ্যাধর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিনকার সে স্মৃতি আজিও নয়নে লাগিয়া আছে।

প্রথম পরিচয় দিনে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নবীন বয়সের সে

লাবণ্যলীলার উল্লেখ করিয়া যখন বলিলাম, "আমার জন্মস্থান নলকুঁড়া গ্রামের কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক মকর্দ্দমা উপলক্ষে বারাসতের আদালতগৃহে বিচারাসনে উপবিষ্ট আপনাতে, আর এই প্রবীণ ও পরিণত বয়সের আপনাতে কত প্রভেদ। আপনার সেই বাবরীকাটা রুক্ষ অথচ ঘন-কৃষ্ণবর্ণ-কেশরাশি-পরিশোভিত মুখ যে দেখিয়াছে, সে আজ আপনাকে দেখিয়া সেই বঙ্কিমবাবু বলিয়া কখনই চিনিতে পারিবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আপনি আমাকে বারাসতে দেখিয়াছিলেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ, এক বামুনের ছেলের বিবাহবিভ্রাটের মামলা আমার স্মরণ হইতেছে। সেইদিন দেখেছিলেন? সে আজ কতদিনের কথা, আর এ শরীরের উপর দিয়া কত শত প্রকারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচারও হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। বেঁচে আছি সময়ে সময়ে ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।" আমি যেই বলিলাম, "সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘজীবন-যাপনের উপযোগী আয়োজনের ত অভাব ছিল না, তবে কেন এমন হইল?" উত্তরে বলিলেন, "কতগুলি অত্যাচার শুনিবেন? প্রথম চাকরীর চাপ, চাকরীতে মানুষ আধমরা হয়। তার উপর নিজের সখ—কিছু লেখাপড়ার রোগ ছিল। বঙ্গদর্শনের জন্য কত রাত্রি যে জাগিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। ঘাড়ে ভূত চাপার মত, আমার বিশ্রামসুখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর মনকে আমার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে দিবারাত্রি খাটাইয়াছে। ইহার উপর অন্য নানা প্রকারেও শরীরের উপর অত্যাচার হইয়াছে। এখন এ বয়সে আর সাম্‌লাইবার উপায় নাই।” বঙ্কিমবাবুর এই অকপটতা আমার হৃদয়ে সমগ্র শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিল। দেখিয়াছি অনেক লোক, অনেক বড়লোকও অনেক সময়ে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অমরপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের অকপটতা আমার নিকট ঋষিজনোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তার পর বলিলেন, “দেখুন, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু কাজ করিতে বড় সাধ, কিন্তু দেহের অবস্থা সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। মানসিক পরিশ্রমেই মানুষ অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শরীর মন উভয়ের শ্রমের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে হয় ত এখনও আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, কিন্তু এ বয়সের উপযোগী শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্র কোথায়?” শেষে গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দুই চারি জন কর্ম্মীর নাম করিয়া বলিয়াছিলেম, “এঁদের মত স্যর রামেশচন্দ্র প্রভৃতি আমরা কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া নানাবিধ শ্রমকর ক্রীড়া-কৌতুকে অররাহ্নকাল গড়ের মাঠে কাটাইতে পারিলে বোধ হয় শরীরে কিঞ্চিৎ শান্তি ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারিত। কিন্তু এ বয়সে ‘সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশার মত ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও লজ্জাবোধ হয়। আর, সহরের লোক, বিশেষতঃ কলেজের ছেলেরা, বুড়োদের খেলা নিয়ে কত তামাসা করিবে, সেটা বড়ই মুস্কিলের কথা!”

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার কত কথাই আজ স্মরণ হইতেছে। সেগুলি গুছাইয়া লিখেতে হইলে, নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহারই কথা আলোচনা করিতে গেলে, অনেক কথার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, অথচ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলিয়া নিজের কথাও প্রবন্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সম্মত নহি। তাই আজ অনেক কথা হাতে রাখিয়া কেবলমাত্র আর দুই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়মণি মহাশয় যখন উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবসন্ন কলেবরে শক্তিসঞ্চারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকলের কয়েকটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আলবার্ট হলে আহূত সভা সকলের কয়েকটীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। দুই তিনটী বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতুহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয় দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতে পারে কিন্তু ওতে কোনও স্থায়ী ফল হইতে পারে না।

মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।”

এখানে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয় বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে সুর বাঁধিয়া লোকের নাচানাচির মাথায় মুগুর মারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কিরূপ ধর্ম্মের সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহা পাওয়া যায়। অতি স্পষ্টভাবেই তিনি “প্রচারে” সে কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটিমাত্র ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন ব্যক্তি খুজিয়া পাইয়াছিলেন। কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার সমাজ-ধর্ম্মের আদর্শ কত উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল। অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত “ধর্ম্মতত্ত্বে”

কেশবচন্দ্রের নামটি উঠাইয়া দিয়া তাঁহার ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। হায় রে দেশ!

মোগলকুলতিলক আক্‌বর সাহকে আমরা সম্রাটশিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আকবরের বিবিধ-গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল-রাজদরবারকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্বিলীর হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশী অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মিলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগতপ্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম স্মরণ নাই, তবে তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে মোগল-শাসনের উল্লেখ ছিল, এবং আকবরের প্রসঙ্গও ছিল।

সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল, একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুক্কায়িত সত্যকথা প্রকাশ পাইল। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, আকবরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও

তাঁহার উচ্চ উদার রাজনীতি জ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থ-পরতা লুকাইত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে আপন অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন, এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়; উদারতার লেশমাত্র ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, আকবর মোগল-রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের পরিণয় ব্যবহার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আকবর স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসমর্থের পরিচালনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র।”

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি কাল আমায় খুব বাঁচাইয়াছেন। এত লোকের জনতা হবে জান্‌লে কি আমি যেতুম? আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লাবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়্‌বেন। পরে আমি দু’ দশ কথায় আমার মন্তব্য শেষ করিব। এ কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশে মিটীংগুলি কি ঐ রকমই হয়?” এই “ঐ রকম” কথার অর্থ এই যে, সে দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্বিলীর স্বল্পায়তনে হলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বহুলোক অতিকষ্টে একপদ

দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াই কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ; অপেক্ষাকৃত আখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুক্ষভাব পরে অভদ্রোচিত ইতর বচনবিন্যাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্র-নাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য-দর্শন আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, জানি না। বঙ্কিমবাবুর ত নিশ্চয়ই ঘটে নাই। সেই গোলটা থামাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ছিলাম. ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

১

তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনও মনে পড়ে; দুর্ব্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্য্যায়ে আনন্দময় পর্ব্বাহের মত আমার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি; তাঁহার কথা শুনি, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেই দিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্নী—তখনকার মুন্নী—এখানকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই,সি,এস্'—রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিম বাবুর দরবারে আমাদের আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। মুন্নী তখন "সাহিত্যে" আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিম বাবুর কয়েক জন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ, আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও

সহানুভূতি, এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই এক জন বলিলেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই! বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।" আর একজন বলিলেন, "তোমরা নব্য ছোকরা, বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাঙ্গামে দরকার কি?" এক জন বলিলেন "বঙ্কিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।" বুঝিলাম, সই সুপারিস পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার বয়স নয়। "সাহিত্য" ভিন্ন অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্নী পরামর্শ করিলাম, যখন "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে" ঘটিল না, তখন এক দিন "one fine morne" আমরা দুইজনে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই"one fine morne"এর একটু ইতিহাস না বলিলে আপনারা এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয় এবং পত্রে ও কবিতায় সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তার পরিণত হয়। তিনি তখন লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসিতে লিখিতাম। তিনিও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন,

one fine morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই one fine morne এর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই one fine morne আর আসিল না। কোনও কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোনও কাজ করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার one fine morne এর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য, উহাকেও আমরা সেই অনির্দ্দিষ্ট one fine morneএর তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুন্নী আমার কনিষ্ঠ যতীশের সহিত একযোগে কোনও নব-যশস্বিনী মহিলা কবিকে কাদম্বরীর ভাষায় "সাহিত্যে" লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। মহিলা-কবি অপরিচিতের অদ্ভুত পত্র পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিটির কোণে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"দেখা হইবে না।" চিঠিখানি ফেরৎ আসিয়া লজ্জায় যতীশের দেরাজে লুকাইয়া ছিল। আমি সহসা একদিন তাহা আবিষ্কার করি। মুন্নী এখন ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তখন কবি ছিলেন। সরল, উদার, ভাবুক কবি, সংসারের প্রহেলিকায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাহিত্যরসে ভোরপুর মুন্নীর ভাবোচ্ছ্বাস, এবং যতীশের বাছা বাছা সংস্কৃত কাদম্বরী পড়িয়া আমার খুব আমোদ হইয়াছিল কিন্তু "দেখা হইবে না"–তেমনই সাংঘাতিক মনে হইল! কেন না, ইহার পর আর তাঁহার রচনা পাইবার আশা করা যায় না।

মুন্নীকে বলিলাম, হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে, এইবার হাটে পাঠাইব। মুন্নীর সেদিনকার"লাজনত আঁখি"আমার এখনও মনে আছে!—অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এ কাহিনী গুপ্ত থাকিবে। —আজ এ কথা ছাপিয়া দিলাম। জগৎ শেঠ বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।

ইহাও সেই প্রতিহিংসা। জীবনের প্রভাতে যাঁহাদের ভরসায় "সাহিত্যে" হাত দিয়াছিলাম, তাঁহারা এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য ভোগ করিতেছেন। সাহিত্যের ও "সাহিত্যে"র নামগন্ধও তাঁহাদের মনে নাই। আমি একাকী 'মড়া আগ্‌লাইয়া' বসিয়া আছি। মুন্নী "সাহিত্যে"র তদানীন্তন মুরুব্বীদের অন্যতম। প্রতি-হিংসার সাধ হয় না? তাই সেই পৌরাণিকী বিড়ম্বনার কাহিনী ছাপিয়া শোধ লইলাম। আশাকরি, Less majesty হইবে না!

তখন আর একজন "সাহিত্যে"র উদ্যোগী, হিতৈষী, কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে "সাহিত্যে"র জন্য গদ্য-গান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের চাষ করিয়াছিলেন, তারপর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন। আমার শাপ ফলিয়াছে। তাঁহাকেও এত দিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে সাগর-সঙ্গীত শুনিয়া শঙ্খের মত সমুদ্রের আরাব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পরে তিনি নারায়ণের চরণে সোণার তুলসী

দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক। বন্ধুর অসুখ হইলে লোকে বলে, তুমি নীরোগ হও। আমি বলি,—তাঁহার এ রোগ যেন না সারে। এখন দেখুন,—কত ধানে কত চাল। এ নেশার কি মোহ!

আমি এক দিন মুন্নীকে বলিলাম, "চল, বঙ্কিম বাবুর কাছে যাই।" সেই "দেখা হইবে না" মুন্নীর মনে বেশ দাগ কাটিয়া, স্থায়ী হইয়া, বসিয়াছিল। মুন্নী বলিল, "গলা-ধাক্কা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "ষটকর্ণ হইলে মন্ত্রভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া মোট চারি কর্ণ, তাহাতে সে ভয় নাই। গলা-ধাক্কা দু'জনে ভাগ করিয়া লইব। কেহ প্রকাশ করিব না। চল।"

তৎক্ষণাৎ "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও "সাহিত্যে"র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে 'অধৃষ্য' বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা না বলিলে, যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ফুটিবে না।—এইজন্য 'বাজে কথা'র গৌরচন্দ্রিকায় এত 'বাজেতম কথা' লিখিতে হইল। পরে যাহা লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গম্ভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রচিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে যাত্রা করি।

তখন বঙ্কিমবাবু মেডিকেল কলেজের সম্মুখবর্ত্তী প্রতাপ

চাটুর্য্যের গলিতে বাস করিতেন। বাড়ীখানি সাদাসিধে। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্ব্বাস্য হইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে, দ্বারের পার্শ্বেই জলের কল। সেই কলে বঙ্কিম বাবুর খানসামা হুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বঙ্কিম বাবু বাড়ী আছেন?" ভৃত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কি দরকার?" আমি চটিয়া লাল। বলিলাম "বঙ্কিম বাবুর কাছে কি দরকার—তা তোকে বলিব কি রে! তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর—, তুই খবর দে!"

মুন্নী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "কর কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাদা! চুপ্, চুপ্।" ইত্যাদি।

বঙ্কিম বাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শুনিলাম, উপর হইতে কে বলিতেছেন,—"আপনারা উপরে আসুন।"

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক "শালপ্রাংশু, মহাভুজ". গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা হুঁকা—তামাক খাইতেছিলেন,—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার ললাটে—তখন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কীর্ত্তিকুসুমের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলাসন নয়,—মা'র আশীর্ব্বাদ।

খানসামা বলিল,—"বাবু!"

এই বঙ্কিমচন্দ্র! বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদুকর বঙ্কিম, দোর্দ্দিণ্ডপ্রতাপ বঙ্কিম! হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল,—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!" উপর হইতে তাঁহার ভৃত্যের সহিত আমার অবিনয়—কলহ বঙ্কিম বাবু দেখিয়াছেন! কিন্তু তখন ভাববার সময় ছিল না।

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি; উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজের সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েলপেণ্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-দেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কৌচ্, কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি টেবিল হারমোনিয়ম্। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাত-কাটা জামা। ধুতিখানি কোঁচানো। পায়ে চটী। পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম, ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"থাক্, থাক্।"

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না। ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্ত্তের উপর আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখিবার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপি-

বদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোরে ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় আর তেমন নাই। এখন ভক্তি হয় ত আরও গাঢ়, আরও সংহত, এবং কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভোরপুর—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না,—এক ভক্তি শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই,—যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা মহান্ হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে, কিন্তু অন্ধ ভক্তির তালকাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে যে দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিন্ধবাদের স্কন্ধবিহারী বুড়ার মত এই নাটুকে সাহিত্য-ভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা ত সুখী হইতে পারি না।

বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"বসুন্"। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক—"ন যযৌ ন তস্থৌ"! বঙ্কিম বাবু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একখানি কৌচ্ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম,—"আপনি দাঁড়াইয়া—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমার বাড়ী,—আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।" আমি বলিলাম,

"আমাদের 'আপনি'—বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়।" বঙ্কিম বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন "আচ্ছা, বসো"।

আমরা সেই কৌচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল; বঙ্কিম বাবু বাঘ নন, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া কথা কন; গলা-ধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে!

আমাদিগকে নীরব দেখিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমাদের দু'জনকেই আমি জানি। তুমি ত বিদ্যাসগরের দৌহিত্র? তোমার নাম সুরেশ, নয়?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ"

আমি বিস্মিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে? সেদিন দীনবন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিস করিতেছিলে। আমাদের হেম করের ছেলে পণ্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখ্লুম, তুমিই জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুন্লুম, তুমি বিদ্যাসাগরের নাতী, তোমার নাম সুরেশ। পরে বঙ্কিমকে বল্লুম তোমাকে ডাকতে। বঙ্কিম যাচ্ছিলেন,—আমি আবার বল্লুম,—ওরা আমোদ কর্ছে—করুক; ডেকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে? এখানে থেকেই ওদের হাসি তামাসা দেখি।"

দীনবন্ধু সেই দীনের বন্ধু, নীলকরের যম, বাঙ্গালীর প্রাতঃ

স্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর! শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। বঙ্কিম তাঁহার তৃতীয় পুত্র.—এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্ত্তমানে সুকবি ও দার্শনিক, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ। পল্টু,—পি,সি, কর, ওরফে প্রথমচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী, অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। হেম-বাবুও ডেপুটী ছিলেন, বঙ্কিম বাবুর সমকর্ম্মী।

তাহার পর মুন্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমাকেও আমি জানি। তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি যেবার বি, এ, দাও, সেবার আমিও ইউনি-ভার্সিটি- হলে গিয়াছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল এত অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছ দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এছেলেটী কে হে? খুব অল্প বয়সে বি এ, দিচ্ছে ত? চেনো?' ত্রৈলক্য বল্‌লে—"ঘনশ্যামের ছেলে।" তোমার ডাকনাম মুন্নী? ভাল নাম কি?"

মুন্নী বলিল, "জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তুমি কি কচ্ছ?"

মুন্নী বলিল, "আমি এম্‌, এ, দিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ও আবার এম্‌, এ, দেবে বলে পড়্‌ছে। আমরা বল্‌ছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান্‌ হবার চেষ্টা কর।

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, ওর বাবা কি বলেন?"

আমি বলিলাম, "তাঁর অমত নাই। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তবে আবার এম্‌, এ, কেন?"

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে কি ?"

আমি অবসর পাইয়া কম্পিত-হস্তে সেই "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও কল্পদ্রুম-কাটা "সাহিত্য" বঙ্কিম বাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দাও, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখ্‌তে বলো না।"

গলা-ধাক্কা বটে! কিন্তু কি সুন্দর, কি মিষ্ট, প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া, সুবুদ্ধির মত তখনই বলিলাম, "যে আজ্ঞে!"

দু'জনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্যসাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল, ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিম বাবু "সাহিত্য" সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি"।

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার দাদা-ম'শায় জানেন ?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-ম'শায় জানেন কি না, তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ভাবি জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অনধিকার-চর্চ্চা করিতে দিতেন না। বাড়ীতেই আফিস ছিল। লুকাইবার জিনিষ নয়, হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, বারণ করেন নাই। মুন্নী বলিল, "বোধ হয়, তিনি জানেন।"

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে' কাগজ বার করে' ফেল্লে। তিনি শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন না?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়্‌বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্যে ত কিছু করা চাই। এতে উপার্জ্জনের আশা নাই। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এ সব কাজ করেছি। এই চাকরী কর্‌তে কর্‌তে লেখার জন্যে ছুটী নিয়ে এখন ভুগ্‌ছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো,—আর ভাল লাগে না, শরীরও বয় না কিন্তু সেই ছুটিগুলো এখন পুষিয়ে দিতে হচ্ছে।'

বঙ্কিমবাবু তখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই।—আমি নিরুত্তর। মুন্নী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ওদের দু' ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?'

মুন্নী বলিল, "তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরেজী পড়্‌লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল করে' পড়া শুনা করে ওরা বাঙ্গলা লিখ্‌বে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখ্‌তে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তবে ভাল।"

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমি লিখিতে পারিব না কিন্তু তোমাদের যখন যা জান্‌বার দরকার হবে, জেনে যেও; আমি অনেক দিন 'বঙ্গদর্শন' চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারী পর্য্যন্ত।"

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিম বাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। "সাহিত্য"র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্নী বলিল, "একবারে 'যে আজ্ঞে' বলে ফেল্লে? এদিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পার্‌লে না?"

আমি বলিলাম, তুমিই কোন্ পার্‌লে?"

সেই দিন হইতে তিন দিন তিনরাত্রি বঙ্কিম বাবুর Warning-এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা, দারিদ্র্য, বিফলতা,—নানা শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত দু'দিকে দুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম,—"যে কাজের সূত্রপাতেই বঙ্কিম বাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।"

বাগান হইতে বেল, জুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাসিত উদ্যানের সৌম্য শ্যাম শ্রী আমার স্বপ্নকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা আশার যবনিকার আমার অক্ষমতা, বিফলতা

ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধূলায় লুটাইয়াছে—কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি, পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিম চন্দ্রের স্নেহ, তাহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মত ও সম্পাদকের অনুমত হয়, পরে আরও বলিব।

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলিবার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সমকক্ষভাবে 'ভিজিট' দিবার রীতি ছিল না। এই জন্য একটা উপলক্ষ না জুটিলে বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটিত। "সাহিত্য" বাহির হইলে বঙ্কিম বাবুর জন্য লইয়া যাইতাম। বঙ্কিম বাবু প্রথমেই লেখক ও লেখিকাদের নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

"সাহিত্য" "বঙ্কিমচন্দ্র" শিরোনামে অনেকগুলি 'সনেট' ছাপা হইয়াছিল। কবি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকের উপর এক একটী সনেট লিখিয়াছিলেন। সনেটগুলি নীচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাই। বঙ্কিম বাবু সে দিন পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়া

ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন —"এস, ভাল, ত?" আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন "বঙ্কিমচন্দ্র আমার বেশ লাগি কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল"। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শনে'র অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়েছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম, তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের 'সাহিত্য'ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিলে, কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন?"

আমি বলিলাম, "আমরা পারি না; জানি না। আপনা আপনির লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐরকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহস হয় না।"

বঙ্কিমবাবু।—"তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই জন্যই বঙ্গদর্শনে'র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া 'রিভাইজ' না করিয়া কাহারও কাপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত; চন্দ্র একেবারে বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী লিখেছেন।—খুব খাটতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এজন্য কেউ ত রাগ করতেন না— তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরেজী গন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম "আপনাদের আলাদা কথা।"

বঙ্কিমবাবু।—"ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও

ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধুলায় লুটাইয়াছে—কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিম চন্দ্রের স্নেহ, তাহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মত ও সম্পাদকের অনুমত হয় পরে আরও বলিব।

২

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলিবার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সমকক্ষভাবে 'ভিজিট' দিবার রীতি ছিল না। এই জন্য একটা উপলক্ষ না জুটিলে বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটিত। "সাহিত্য" বাহির হইলে বঙ্কিম বাবুর জন্য লইয়া যাইতাম। বঙ্কিম বাবু প্রথমেই লেখক ও লেখিকার নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

"সাহিত্যে" "বঙ্কিমচন্দ্র" শিরোনামে অনেকগুলি 'সনেট ছাপা হইয়াছিল। কবি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকের উপর এক একটী সনেট লিখিয়াছিলেন। সনেটগুলির নীচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাই। বঙ্কিম বাবু সে দিন পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"এস, ভাল ত?" আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র আমার বেশ লাগিয়াছে। তুমি ত বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা ত আগে আমায় বল নাই? আমি বলিলাম, "আজ্ঞে। আমি লিখি নাই"।

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "উহাতে নাম নাই দেখিয়া

আমি মনে করিয়াছিলাম,—সম্পাদকের লেখা ; না, তুমি লজ্জা করিতেছ ?"

আমি সেই কবিতাগুলির লেখক হইলে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসা-টুকু আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। সে সৌভাগ্য না হউক, আমি সনেটগুলি বঙ্কিমবাবুর ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া একটু গর্ব্বের, একটু গৌরবের সুখ ভোগ করিতেছিলাম। কারণ, যাঁহার লেখা তাঁহার গৌরবে আমারও আনন্দিত হইবার কথা ছিল। প্রথম জীবনে পরিবারের বাহিরে আমরা যে বৃহত্তর পরিবারের রচনা করি, লেখিকা সেই পরিবারের একজন ছিলেন, আমাকে দাদা বলিতেন।

বঙ্কিম বাবু আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে লিখিয়াছেন ?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "পুঁটীর লেখা"।

বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পুঁটী ? পুঁটী কে ?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "সরোজকুমারী দেবীর লেখা, বাড়ীতে পুঁটী বলিয়া ডাকে,—মুন্নীর বোন।"

বঙ্কিম বাবু।—"ঘনশ্যামের মেয়ে।"

আমি।—"না, মথুর বাবুর মেয়ে,"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "মথুর বাবুর মেয়ে ? তুমি পুঁটী বলে ডাকো, তা হলে তোমাদের চেয়ে ছোট ?"

আমি।—"আজ্ঞে হাঁ—চোদ্দ পনর বছরের বেশী বয়স নয়।"

বঙ্কিমবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "বেশ

ক্ষমতা আছে, রীতিমত চর্চ্চা রাখ্‌লে—ভবিষ্যতে ভাল হবে। তুমি তাকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে"।

আমি আবার একটী "আজ্ঞে" বাহির করিলাম। বঙ্কিম বাবু আবার বলিলেন, "আমার বইগুলি এত ভাল করে পড়েছে; আমার উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমার আনন্দ হবে, এ কিছু বেশী কথা নয়; আমার নিজের কথা এমন করে' কেউ লিখ্‌লে, খারাপ হলেও হয়ত ভাল লাগতো, কি বল? সে জন্য ত আমার আহ্লাদ হবেই, আর তা বলতেই বা দোষ কি? কিন্তু আমি সে কথা বলছি না, সত্যই এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে, কবিতাগুলি বেশ হয়েছে; তুমি তোমাদের পুঁটীকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও!"

আমি বলিলাম, "বলিব। পুঁটী শুন্‌লে খুব খুসী হবে। সেদিন বিহারী বাবুও কবিতা গুলির প্রশংসা কচ্ছিলেন।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"কোন্ বিহারীবাবু?"

আমি বলিলাম, "সারদা-মঙ্গলের বিহারী চক্রবর্ত্তী।"

বঙ্কিমবাবু। "তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? তিনি কি করেন?"

আমি যাহা জানিতাম, বলিলাম। বিহারী বাবু পৌরহিত্য করিতেন, এ প্রশ্নের উত্তরে উহাই বলিতে হয়, তাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু "সারদা মঙ্গলের" কবি, আমার মনে হয়, সংসারের কিছুই করিতেন না। তিনি করিতেন, সাহিত্যের পৌরহিত্য। গুরু-

দেব হইবার রীতিমত বন্দোবস্ত ও সরঞ্জামও ছিলনা; ধনী ছিলেন না,—অভাবও ছিল না।; সৌভাগ্যক্রমে স্বল্পে সন্তুষ্ট ও তাঁহার গুরু বিদ্যাসাগরের মত "স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা ছিলেন। যজমান প্রতিপালন করিয়া মঠ গড়িয়া ভক্তিশ্রদ্ধার 'ব্যাপারে'র জন্য আড়তও করেন নাই। তাঁহার নিমতলার বাড়ীর নীচের ভাঙ্গাঘরে দুই চারি জন যজমানের সমাগম হইত। তিনি সাহিত্যে মস্‌গুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্যরসের যজমানের মধ্যে সে সময় প্রধান ছিলেন, সাহিত্য-রসিক প্রিয়নাথ সেন ও কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তক্তপোষ বাজাইতেন। সে তক্তপোষে একখানা মাদুরও ছিল না। আর নিজের কথাবার্ত্তায়, আচারে, ব্যবহারে, মন্তব্যে "ভোক্‌গে সে এ বসুমতী যার সুখী তার" এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেন। বেহারী বাবু বঙ্কিম বাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, বেহারী বাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি বঙ্কিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক—কিছু শুনিব কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটী গল্প শুনিয়া বলিলেন, "জীবনেও Poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত!"

আর একদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম; সে দিন বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। একটী সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সম্মুখে উত্তরদিকে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুই তিনখানি

চেয়ার, পশ্চিমে দুইটী আলমারী। উত্তর ও দক্ষিণের জানালা উন্মুক্ত। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। একটী ছোট গড়গড়া, তাহাতে দীর্ঘ কাঠের নল। দেখিলাম, সচরাচর লোকে নলের যে দিকটা গুড়গুড়িতে লাগায়, বঙ্কিমবাবু সেই দিকটাই তামাক খাইতেছেন। অপর দিকটা গড়গড়ার রন্ধ্র মুখে সন্নিবিষ্ট। আমি মনে করিলাম, বুঝি ভুলিয়া উল্টাদিকটা মুখে দিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নয়, নলটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। আবার মুখে দিবার সময় দেখিয়া উল্টাদিকটাই মুখে দিলেন।

বঙ্কিমবাবুর টেবিলে চায়ের পেয়ালা ছিল। বঙ্কিমবাবু পেয়ালাটী তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চা খাবে ?"

আমি বলিলাম, "থাক্;—আপনার চা ত হইয়া গিয়াছে।—"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "খাও ত ?—মুরলী !"

মুরলীধর হাজির হইল। বঙ্কিম বাবু আমার জন্য চা আনিতে বলিলেন।

মুরলী, বঙ্কিম বাবুর সেই খানসামা।—প্রথম দর্শনেই যাহার সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। পরে তাহার সহিত আমার আপোষ হইয়া গিয়াছিল; মুরলীর সঙ্গে আমার একটু 'প্রেম'ও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরের উকিল হেমেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। মুরলী আর ইহ লোকে নাই,—বোধ হয় আবার বঙ্কিম বাবুর তামাক সাজিতেছে, যদি নরক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত ট্রাম হইয়া থাকে, এবং যমদূতকে সাধিয়া ছুটী পাই,

তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন মুরলী দ্বার ছাড়িয়া দিবে, হাসিমুখে 'আসুন' বলিবে, এবং লুকাইয়া তামাক সাজিয়া দিবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শ-নে'র অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়েছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের 'সাহিত্যে'ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন?"

আমি বলিলাম, "আমরা পারি না; জানি না। আপনা আপনির লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐরকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহস হয় না।"

বঙ্কিমবাবু।—"তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই জন্যই বঙ্গদর্শনে'র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া 'রিভাইজ' না করিয়া কাহারও কাপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত, চন্দ্র একে-বারে বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী লিখেছিলেন।—খুব খাটতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এজন্য কেউ ত রাগ করতেন না—তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরেজী গন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের আলাদা কথা।"

বঙ্কিমবাবু।—"ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও না। এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায়। আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা পাকে তা জান ?"

আমি।—"আমরা পারিব কেন ?"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমরাও কর। আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে' না দেখে' প্রেসে দিই নি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা লিখ্‌তেন। দিব্যি ঝর্‌ঝরে বাঙ্গলা।—জানতুম্ তাঁর লেখা প্রুফে একটু কেটে' কুটে দিলেই যথেষ্ট হবে।"

"শকুন্তলা" বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলা-তত্ত্ব।" বোধ হয়, না বলিলেও চলিত। কিন্তু এখনকার লেখকেরা ও পাঠকপাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারের কোনও গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না। এই জন্য এখনকার সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার—বিশ পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনও প্রাণের যোগ নাই। গত পুরুষের স্থপতিরা যে বনিয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে; তাহার উপর শৈবাল ও আগাছা জন্মিতেছে। এখন যাঁহারা গড়িতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বালীর উপর খেলা-ঘরের পত্তন করিতেছেন।

বঙ্কিম বাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির গবেষণার, রচনার, মধুর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, দুই একবার সেই প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই এক বিন্দু

অশ্রুর উদ্গমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর ক্ষুদ্র "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম "বিধি-দত্ত ধন"। তাঁহার "নানা প্রবন্ধ" বাঙ্গালী এখন পড়েন কি না জানি না; কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া 'বাঙ্গালী' বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙ্গালার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এই সকল পুণ্যশ্লোককে কখনও না ভুলি। বর্ত্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ নাই কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র; বর্ত্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

এই দিন বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,- "আপনি কি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ দেন? আপনার লেখায় কোথাও কোথাও এই রকম দেখিতে পাই; সর্ব্বত্র নয়।" বঙ্কিম বাবু আপনার দক্ষিণ কর্ণে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"কান। আমার প্রমাণ – কান। যা কানে ভাল লাগে, তাই লিখি, অত নিয়ম মানিতে গেলে চলে না।" আমরা আজ কাল এই নিয়মেই চলিতেছি। সর্ব্বত্র কানই

আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে ; কবিতায় ত কথাই নাই ; তবে তাহা সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কানের জন্য রচা হয়, কান পর্য্যন্তই যাহার গতি, কানেই তাহার স্থিতি, এবং কানেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবন্মুক্তি, তাহা প্রমাণের জন্য কান ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, আমাদের কান সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কানের অপেক্ষা একটু 'দীর্ঘ'। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলিবার জন্য এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।

৩

১২৯৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্নী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাপিতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। মুন্নী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্রেরা তাহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাঁহাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের রচনার অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদেয় রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্ততঃ সভ্যদের ব্যবহারের জন্য, কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্নী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতিলাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পরদিন প্রভাতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন।

সে দিন তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মূন্নীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের—মোক্ষমূলরের উক্ততোরণের মনীষী ও সাহিত্য রসিক ছাত্রসম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আস্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবুও আনন্দিত হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনও ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, সম্মতিও দিলেন না! আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু গড়িয়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্মিত-মুখে বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "মুন্নীরা আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে:—হয় ত বিদেশী সহপাঠীদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজী করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছি, না ছাপাই ভাল।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publisherদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন, Publisherরা নিজের

খরচে বাঙ্গালা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন Problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অন্য উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবেনা। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠি-পত্র চলিয়াছিল।"

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি। উভয়ে মসগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—"মুন্সীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি যে রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন "তোমার যে বড় আগ্রহ! তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন, শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই ছাপিব। তোমাকে বলি —আমার দুই একখানা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমার পছন্দ হয় নাই! আমি নিজে অনুবাদ করিব, ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই উহা-দের অনুবাদ করিব—ভাবিয়াছিলাম! এই দেখ—"

বঙ্কিমবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন; ঘরের পশ্চিমদিকে একটি আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন; আলমারী খুলিয়া সকলকার

উপরের তাক হইতে একখানি বড় বাঁধান খাতা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "দেখ, কত খাটিয়াছি। অনুবাদ করিয়াছি। কাটিয়া কুটিয়া আবার 'ফেয়ার' করিয়াছি। তাহার পর বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছি।—"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "তবে এইখানিই দিন!"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আমি বিলাতি Publisherদের কাছে থেকে estimate পর্য্যন্ত আনাইয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম ছাপাইয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম "সে কি? অক্সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রদের ভাল লাগিল, ইংরেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না?"

বঙ্কিমবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আমার হাত হইতে দেবী চৌধুরাণীর পাণ্ডুলিপির খাতাখানি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবু একবার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি অমনই সুযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া, আব্দার করিয়া বলিলাম, "একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভাল লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয়; তাহারা গালাগালি দিবে!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "গালাগালি দিবে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন "হাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? Poligamy বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটী বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশেও ত 'বহুবিবাহ' দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।"

আমি তবু নিরস্ত হইলাম না; সাহস করিয়া বলিলাম, "তাহা ত পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমাদের আব্দার রাখিতে পারিলে আমি খুসী হইতাম। কিন্তু আমি এখন ইংরাজীতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।"

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং মুন্সীকে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। Private criculationএর জন্য ছাপিবারও বঙ্কিমবাবু অনুমতি দিলেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর কৃত "দেবী চৌধুরাণী"র অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন শ্রীমান পূরেন্দুসুন্দরকে দেবীর অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজের অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনুবাদকদিগকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্ব্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু আমার মত নাবালকের নিকট তাঁহার আপত্তির সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না।" তিনি কি অনুকুল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাস ত উদ্দেশ্যমূলক নয়। সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাঁটী 'স্বদেশী' ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে 'স্বদেশ' দেখাইয়া ও চিনাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্যই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য সেবাও নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক, ইহাই হয় ত তাঁহার কামনা ছিল।

* * * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?"

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্যই উপন্যাস লিখিতেন ? বঙ্কিমবাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনেক দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার ইচ্ছা আছে,—হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমবাবু অনেক দিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন : বেদের দেবতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা 'হইয়া উঠিবার' পূর্ব্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন ?" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না ; আরম্ভ করিতে পারিলে শেষ হইয়া যায়। – যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তা হ'লে, ইংরেজী করে' ছাপান যাবে। কি বল ?"

আমার সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুর মনে ছিল। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

* * *

১২৯৯ সালে বাঙ্গালা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরম্ভ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সন্নিহিত

হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চরমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাঁদরামী দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী; সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে "জন্মভূমি"তে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল বাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের অষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, "সাহিত্যে"র এক জন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য, প্রতিষ্ঠাশালী সুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন; এবং "সাহিত্যে" ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

প্রবন্ধটি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পড়িলাম। আমাদের "সাহিত্য" তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল। এখন গণও নাই তন্ত্রও নাই; জনও ত খুঁজিয়া পাই না।—যাক, এখন গণের কথাই বলি! এই রচনার লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে 'বানর' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই।"

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন; কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাই তখন "সাহিত্যে"র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার লেখা না ছাপা সুবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম। কিন্তু সকলেই স্বীকার

করিলেন, প্রবন্ধটির শ্লেষ বিদ্রূপ খুব smart হয় নাই। কিন্তু এক জন—হায়! তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "রচনা বেশ হইয়াছে। তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না।" নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল। অমন স্নেহময় প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না। অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। সাহিত্যই তাহার জীবনের সম্বল ছিল। কাব্য ও কবিতা ও কলাসৌন্দর্য্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত। সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবিলতা, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। নলিনীকে আমরা 'কবি' বলিয়া উপহাস করিতাম। নলিনী টুর্গেনেফ্, টলষ্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। চৈতন্য-লাইব্রেরীতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানী করে, তখন অনেকের পক্ষে সে সকল প্রহেলিকা ছিল। শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত,—সংসারের কুটিল চক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্যান্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

"দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর!" নলিনীর পক্ষে অন্বর্থ বলিয়া মনে হইত। নলিনীর জীবন বলিত—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন তপোবন-স্থলে!"

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধ হয় মনে মনে বলিতেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসা ঘেঁচ্‌কী, মোপাঁসার ছ্যাচ্‌ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে! কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোপাঁসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর পারামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।"

দুই দিন পরে অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বসো।" তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যুঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা

করিতেছেন! মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে!" বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে একখানি সোফায় বসিলেন,-আমাকে বলিলেন, "মেয়েটি আমার সই!"

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধূলা করি। হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই নাই। তুমি বাজাইতে পার?"

আমি বলিলাম "না।"

"গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?"

"আমি খুব ভালবাসি।"

"তবে শেখ না কেন?"

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই। কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা, যত্ন, কিছুরই ক্রটী হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবিষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্ত্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর 'দাদা' আর আমার দাদামশায়ের কথা

এক সঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ যে সর্ব্বস্ব—জীবন দিতে পারি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।"

"আপনার কি মত?"

"তুমি সম্পাদক—তোমার মত কি আগে জানি?"

"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি? আপনার মত কি বলুন?"

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আগে তোমার মত কি বল।"

আমি বলিলাম, "আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।"

"কেন? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ? আষাঢ় মাসের 'সাহিত্যে' ত 'সমুদ্র-যাত্রা'র পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ?"

"প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কি না, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি।"

"তবে এটা ছাপিবে না কেন?"

"যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে। এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোনও লাভ নাই।"

"গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ?—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয়; জান?"

আমি বলিলাম, "এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে ?—ইহার ব্যঙ্গ —"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার কি মনে হয় ?"

আমি বলিলাম, "আমার খুব smart মনে হয় নাই।"

"সবই কি খুব smart হয় ?"

আমি বলিলাম, "প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি রসিকতা হয় ? পুরাণো কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি ?"

"পুরাণো কাসুন্দী ?"

"আপনার সেই ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবেও রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্য, গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি, সেই কুকার্য্য নিজেরা করিতে পারি।—তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—"

"না ; আমি তোমার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না।—বাবু যদি চটেন ? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন, এবং বেশ লেখেন।"

"আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব।—তাতেও যদি চটেন, আমি কি করিব।"

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুসী হইলেন। পকেট হইতে সেই রস-রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—' আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না। আর ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব original—smart,—to the

point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালিই নহে।"

আমি বাড়ীতে আসিয়া প্রবন্ধটী ফেরত দিলাম। মহিলা-সম্পাদিত একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি ঠিক বঙ্কিমবাবুর মত ছিল, এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশা করি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দ্দনদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে নাক তুলিয়া আমার শ্রাদ্ধ করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি! আমি কিন্তু কলমটি রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব বিফল করিলেন কেন? অথবা, "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ"—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে।

৪

বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়ীতেও বঙ্কিমবাবুর পিরাণের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্ ঝক্ চক্-চক্ করিত! খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত: কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা; মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিরাইয়া, ধীরে ধীরে, তামাক টানিবার আয়েস ভোগ করিতেন। বাড়ীতে ঢুকিলে, ঘরের চারি দিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্য,

রচনায় সৌন্দর্য্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য্য, শব্দ চয়নে সৌন্দর্য্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীও সৌখীন, সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির 'রচনা-রীতি' খুব সৌখীন।

সেকালে "সাহিত্যে"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকা। ইহা 'রাজসংস্করণ'। রাজসংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা সংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। এক জন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী;— টাঙ্গাইলের জমীদার কবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। ইনি এখন 'রাজা'র ভাই দাদা বটে।

যাক্। অবশিষ্ট নিরনব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই রাজসংস্করণের "সাহিত্য" লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। "সাহিত্য' খানি হাতে করিয়া লইলেন; বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার!" উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?"

আমি বলিলাম, "এক শত এই রকম ছাপা হয়, সব নয়।"

"তাতেও ত অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?"

"কেহ নয়। আমরা সখ করিয়া ছাপি! এক জন গ্রাহক হইয়াছেন!" প্রমথবাবু নাম বলিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বইগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দামও বাড়াইতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশের লোক বেশী দাম দিয়া কিনিতে পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রী কমিয়া যাইবে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তা হ'তে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব "

আমি বলিলাম 'দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।"

"তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, এ দেশে এখনও cheap literatureএর সময় হয় নাই। আমার মনে হয়, উপন্যাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।"

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিলাম,"সকলের সুবিধার জন্য আমরা 'সাহিত্যে'র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, ' তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—'সাহিত্যের' দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। 'বঙ্গদর্শনে'র সময়েও দেখেছি, 'প্রচারে'ও দেখি-

য়াছি ;—যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।”

“যাহারা খুব গরীব তাহারা কি পড়িতে পাইবে না।”

“খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায় এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প! আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; নাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literatureএর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিষ সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়া শুনা থাকিলে যে সব জিনিষ পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literatureএর সম্বন্ধ আছে।”

তারপর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “দিব্যি 'get-up' হইয়াছে।”

আমি বলিলাম, “আমরা ত আর কিছু করিতে পারিব না। কাগজে, মলাটে, বাহারে না হয়—”

“কেন? তোমাদের কাগজ ত বেশ হইতেছে।”

আমি বলিলাম, “আপনি যদি 'বঙ্গদর্শন' ঘুড়ির কাগজে বট-তলার ছাপাখানায় ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব?”

মনে করিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন ; বলিবেন,

"তা বটে।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তোমারা না পারিবে কেন? এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, 'বঙ্গদর্শনে'র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎসামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যে'র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তর 'মৃত্যুর পরে'— উঁচু দরের লেখা। 'বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।—তোমরা পারিবেনা কেন? 'বঙ্গদর্শনে'র কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে; তোমাদের কাজ তোমরা কর।"

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "মৃত্যুর পরে"র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর styleএরও তিনি প্রশংসা করিতেন।" "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের 'বৈদিক প্রবন্ধাবলী"ও "বেদ প্রবেশিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় দুই-ই ইতুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, "আপনার লেখা? আপনার প্রবন্ধ, সমালোচনা, উপন্যাস,— সে রকম আর কে লিখিবে? সে গৌরব ত আর কোনও মাসিক ভাগ্যে ঘটিবে না! আপনি ত আর কোনও কাগজে লিখিবেন না।"

"আর লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই; আমার সেই প্রথমদিনের হুকুম মনে আছে।"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ এত টাকা খরচ করিতেছ; 'বন্ধ করিয়া দাও' বলিতেও ইচ্ছা হয় না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচপত্রটা চলিয়া যায় এমন কিছু করা যায় না?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যায়। সে উপায় আপনার কাছে। আমার বলিবার উপায় নাই।"

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, "একটাই দিন না।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, শুধু তোমাকে একটা দিলে ত চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতীদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার 'ভারতী' আছে। রবি আসেন; জান ত, 'প্রচারে'র সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'সাধনা' আছে। তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে। তার পর আর এক আছেন,—আমার বেয়াই দামোদর বাবু।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার 'প্রবাহ' ত নাই। তিনি কি আবার—

"না ; তিনি 'নব্য ভারতে'র জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছি—আমা দ্বারা হইয়া উঠিবে না।—এখন, তিনটী লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা ত বলিতে পারি না।"

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল, হারাণবাবু আসিয়াছেন বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন 'হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন, জান?—বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু হারাণবাবুকে আর এক দিন পাঠাইয়াছিলেন। 'জন্মভূমি'র জন্য আমার উপন্যাস চান। পাঁচ শত ধাকা, দিতে চাহিয়াছেন।"

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু স্বনামধন্য, এখন রায় সাহেব হইয়াছেন। কোনও চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে হয় না। হারাণচন্দ্রের জন্য মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায় সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বসুন হারাণবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না।"

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহাও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, না। তার পর হারাণবাবুকে বলিলেন, "সাহিত্যের get-up দেখুন।"

হারাণবাবু বলিলেন, "কখানিই বা ছাপা হয়? 'জন্মভূমি' অনেক ছাপিতে হয়, ; 'জন্মভূমি'র ছাপাও মন্দ নয়।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

হাসিতে হাসিতে হারাণবাবু বলিলেন, "যোগেনবাবুকে কি বলিবেন ?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বলিবেন—আমি পারিব না।" তার পর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই এক টান তামাক টানিয়া বলিলেন, "ভক্তি প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি ?"

হারাণবাবু বলিলেন, "আমি আর এক দিন আসিব।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কিন্তু আমাদ্বারা হইয়া উঠিবে না।"

আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম তাঁহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই। আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা-নয়নে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

পরিশিষ্ট—১ম

বঙ্কিম দ্বাদশবার্ষিকী

সম্মুখে পবিত্রসলিলা ভাগীরথী। সুরতরঙ্গিণীর দুই পারে দুই চিতা প্রজ্জ্বলিত। পশ্চিমে গগন-সূর্য্যের চিতা নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। পূর্ব্বপারে বঙ্গসাহিত্য-সূর্য্যের চিতা ধূধূশব্দে প্রস্ফুরিত হইতেছে। দুই চিতার আলোকে সমস্ত নীলাকাশ পিঙ্গলবর্ণ, গঙ্গার ধবলধারা পাটলীকৃত। দুই চিতা দুই পারে নিবিল। তমোময়ী রজনী পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায় চিতাচিহ্ন দেখিতে আসিলেন। সেই অন্ধকারে বঙ্গে তেরশত (১৩০০) অব্দের চৈত্রমাসের ষড়্‌বিংশ দিবস ডুবিয়া গেল। পরদিনে গগন-সূর্য্য নবীনকিরণে পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া আবার গগনে উদিত হইলেন। কিন্তু বঙ্গের সাহিত্যগগনে সেই বরেণ্য সূর্য্য আর উঠিলেন না। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, ঋতুর পর ঋতু কাটিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আজ সেই ২৬শে চৈত্র। চক্ষের সম্মুখে হৃদয় বিদারক সেই সূর্য্যাবসানের চিত্র। চতুর্দ্দিকে আবার সেই শোকভার—যামিনীর অন্ধকার। বঙ্গের এই গভীর নৈশ অন্ধকার দূর করিতে বঙ্গের সেই হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আর উদিত হইবেন না। হে বঙ্গসাহিত্যগুরু, জ্ঞানের আনন্দালোক লইয়া তুমি আর আমাদের নেত্রপথে আবির্ভূত হইবে না। তোমার পবিত্রচরণরজঃ আর আমরা

গৌরবপরাগরূপে ধারণ করিতে পাইব না। হে দিব্যজ্যোতিঃ ভারতীর বরপুত্র—তুমি সমগ্র এ গৌড়ের ভক্তিপুষ্পমালা বক্ষে ধারণ করিয়া চন্দনকাষ্ঠের সৌরভময় অগ্নিরথে আরোহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সেই যে ত্রিদিবধামে চলিয়া গেলে, আর আসিলে না। সে অবধি তোমার জন্য আমরা নিত্য বিলাপ করিতেছি। আমাদের এ বিলাপ তোমার সে সুখধামে পৌঁছায় কিনা জানি না। কিন্তু তুমিই একদিন তোমার হৃদয়বন্ধু দীনবন্ধুর শোকে বিলাপ করিয়াছিলে—

ক্বনু মাং ত্বদধীনজীবিতং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইব বিদ্রুতঃ॥

এ বিলাপের শেষে তুমিই আবার বলিয়াছিলে—

'স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ উৎসর্গ হইল।'

হে দীনবঙ্গের ভাববন্ধু, আমরাও আজ তোমার কথায় তোমার জন্য বিলাপ করিতেছি। তোমাকে আমাদের বার মাসই মনে পড়ে। তোমাকে লইয়াই আমাদের ঋতুবর্ণনা, বর্ষ গণনা হয়। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিলেই দেবীরাণীর ঋণজাল হইতে ব্রজেশ্বর সেদিন মুক্ত হউন আর নাই হউন, তোমাকেই মনে পড়ে। জ্যৈষ্ঠমাস তুফানের সময় আসিলেই, নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্য মাথায় করিয়া নৌকাযাত্রা করুন আর নাই করুন, তোমাকেই মনে পড়ে। যখন কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন নৈশগগন নীলনীরদ-মালায়

আবৃত হইলে কোন বিপন্ন অশ্বারোহী বিদ্যুদ্দীপ্ত মান্দারণের পথে অশ্বচালনা করুন আর নাই করুন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন নিদাঘের দারুণ রৌদ্রে পৃথিবী অগ্নিময়, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, তখন সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া মহেন্দ্র ও কল্যাণী, শিশুকন্যা কোলে লইয়া 'পদচিহ্ন' পরিত্যাগ করিয়া যাউন আর নাই যাউন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন বর্ষার জল-প্লাবনে নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টল টল করিতে থাকে, প্রাবৃটের সেই ম্লানকৌমুদী-রঞ্জিত খরস্রোত ত্রিস্রোতাবক্ষে বিচিত্র বজরার উপরে ঢল ঢল যৌবনা জ্যোৎস্নাবর্ণা 'দেবী' সুন্দরীর দিব্যকরে বীণা ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠুক আর নাই উঠুক তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন নবীন শরদুদয়ে বহুত পিয়াসার চন্দ্রমাশালিনী সা মধুযামিনী নির্ম্মল নীলাকাশে স্থলে জলে বাপীকূলে হাসিতে থাকে, তখন বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে মৃণালিনীর জনম সাধ মিটুক আর নাই মিটুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটীরূপে শোভা পায়, তখন ধরিত্রীর সেই মনোমোহিনী সুষমা দেখিতে দেখিতে ললিতগিরি-পদতলে হস্তিগুম্ফার অভিমুখে সঞ্চারিণী দীপশিখারমত দুইটী সন্ন্যাসিনী পথ আলো করিয়া চলুন আর নাই চলুন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন কার্ত্তিক মাসে মাঠের জল শুকাইয়া আসে, পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসে, কৃষকেরা ক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে আরম্ভ করে, যখন প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব

হইতে শিশির ঝরিতে থাকে, সন্ধ্যাকালে প্রান্তরে প্রান্তরে ধূমাকার হয়, তখন অভাগিনী সূর্য্যমুখীর সংবাদগ্রহণে মধুপুরগ্রামে নগেন্দ্রের শিবিকা বাহকস্কন্ধে ছুটুক আর নাই ছুটুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন মাঘমাসে আমাদের দেশে সাগরের শীত পড়ে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করে, তখন সাগর-সঙ্গমে দিগ্‌ভ্রান্তনৌকাযাত্রীর স্বার্থানুবন্ধসূত্রে বিপন্ন নবকুমার, সেই গম্ভীরনাদিবারিধিকূলে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অবেণীসম্বদ্ধ সংস-র্পিতকুন্তলা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শনে বিহ্বল হউন আর নাই হউন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন বসন্তে সুখের স্পর্শে এ সংসার শিহরিয়া উঠে, অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠে, কোকিল পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে নভো-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন গোবিন্দলালের মনোরম বৃক্ষ-বাটিকার বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়া কুহু-কুহু-কুহু রবে উন্মনা রোহিণী 'দূর হ কালামুখো' বলিয়া রসিকরাজ পিক-বরকে সমাদর করুক্ আর নাই করুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। প্রকৃতির এই বিচিত্র রঙ্গালয়ে যখনই কোথাও সুন্দরে ভয়ানকে মিশে, যখনই কোথাও করুণে গম্ভীরে, যখনই যখনই উজ্জ্বলে মধুরে মিশে, তখনই তখনই তোমাকে মনে পড়ে। তাই বলিতেছিলাম—বারমাসই তোমাকে মনে পড়ে। কি শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, কি করালবদনী নিশীথিনী—কি রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা, কি বাদলের অন্ধকার—সকল সময়েই তোমাকে মনে পড়ে। তুমি যেন দিবা, নিশা, ষড়্‌ঋতু, দ্বাদশমাস সম্বৎসর

রূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হও। হে সৌম্য, হে অসেচনক, তোমার এই বিবিধরূপেই তবে তোমাকে নমস্কার করি—

* ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমোনমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা ॥
হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ ॥

তুমি আমাদের অতি প্রিয় ছিলে, আমরা তোমার অতি প্রিয় ছিলাম। কিন্তু তোমার সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ কার হইবে না। তুমি বঙ্গভূমির অতি প্রিয় সন্তান ছিলে, বঙ্গভূমি তোমার অতি প্রিয় ছিল—কিন্তু তোমার সে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা জন্মভূমি জননীকে বন্দনা করিতে এ বঙ্গে তুমি আর আসিবে না। তুমি বঙ্গভাষার প্রাণ ছিলে, বঙ্গভাষা তোমার প্রাণের বস্তু ছিল, —কিন্তু সে বঙ্গভাষাকে মহিমময় করিতে এ বঙ্গে তুমি আর আসিবে না। তুমি যে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে নির্জীব বঙ্গজাতিকে সঞ্জীবিত করিয়াছ, তোমার সেই মহামন্ত্র গান করিয়া আজ আমরা সপ্তকোটি কণ্ঠে আকুল হৃদয়ে তোমাকে ডাকিতেছি— কিন্তু তুমি আমাদের আর দেখা দিবে না। তুমি এখন যে দেশে আছ সে মধুময় দেশ। তোমার সে মধুর মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে আজও বিরাজিত রহিয়াছে। তোমার বদনমণ্ডল মধুর ছিল— তোমার হাস্য অতি মধুর ছিল; মধুময় ছিল তোমার রসনা— অনন্ত মধুময় তোমার রচনা। হে বঙ্গমধুকর বঙ্কিমচন্দ্র!

তোমার সকলই মধুর। তুমি মধুমাসে চলিয়া গিয়াছ। অদ্য-কার এই মধুযামিনী তোমার মধুর নামে মধুময় হউক্।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ। মাধ্বী র্ণ সন্তোষধী র্মধু নক্তমুতোষসো॥ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

তুমি মধুময় দেশে আছ। তোমার মধুনামে আজ বায়ুগণ মধু বহন করুক। ভূতলের বারিরাশি মধু ক্ষরণ করুক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক। আমাদের ওষধিগণ মধুরসযুক্ত হউক। বনে বৃক্ষ সকল মধুফলশালী হউক। গৃহের গবীসব মধদায়িনী হউক। আমাদের পালনকারী আকাশ মধুবর্ষী হউক। সূর্য্য মধুমান্ হউন। নিশা মধুময় হউক। উষা মধুময় হউক। হে মধুরাত্মন্! তোমার মধুময় নামে আজ সকলই মধুময় হউক—সকলই মধুময় হউক—সকলই মধুময় হউক।

শ্রীযতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট—১

BABU BANKIM CHANDRA CHATTERJEE.

[By N. N. Ghose.]

The kingdom of letters in Bengal is to-day without its lawful head, for Babu Bankim Chandra Chatterjee is no more. Last week we reported his illness, but before the news reached many of our readers the precious soul had left its fragile tenement. Babu Bankim Chandra fell a victim to the disease which has been the canker of so many a valuable life in this country, diabetes. If anything else was the immediate cause, it was itself a consequence. The sense of loss is universal in Bengal, at any rate among the classes that can read and write. There was no more conspicuous figure in Bengalee literature, none that had more deeply impressed the national mind, so far as it was conversant with letters at all. Next to the Ramayana and the Mahabharata, the books that have been most largely read in recent years in Bengal have been the novels of Babu Bankim Chandra Chatterjee. This is not the place to descant on their merits. It is sufficient to state that they are not at all like the first crude attempts at prose fiction among a people practically without literature, but they are works of rare merit which would be eminently worthy of a great writer among a great people in an era of literary expansion. Babu Bankim Chandra had a many-sided mind and a varied activity, but it is as a novelist that he will live. The critic, the philosopher, the official functionary of criminal justice, will be sunk in the man of letters. His novels will be read and admired as long as the Bengalee language or Bengalee life endures. It is said, however, that in his latter days he wished, like some other great men before

his time, most of what he had written to be blotted out. He regretted the waste of time and power which they symbolised, for he had discovered his serious function, his chief mission in life, to be the exposition of the philosophy of religion and in particular of Hinduism in its different aspects. Great is our own regret that he should have been cut off from us so soon after he had realised a great purpose in life, and, by retirement from service, had acquired leisure to pursue it,—a purpose moreover which he was so well fitted by endowment and acquisition to accomplish. His paper on the Vedas to which we made a slight allusion last week was even more valuable as a promise than as a performance. That promise, alas ! is destined to remain an unrealised dream.

Not the least remarkable feature of Babu Bankim Chandra's intellect was its versatility. It is not often that the constructive imagination of the novelist is associated with the abstract, analytical, generalising faculty of the philosopher, but Babu Bankim Chandra was rich in both the powers. Indeed we are inclined to suspect that by nature he was more of a thinker than a romancist, just as Disraeli was more of a statesman than a writer of fiction. In academic life, we are informed, Bankim Chandra's manifold capacity was the general theme of admiration. He was good in mathematics, in history, and, of course, the languages. He lived, however, to be something more than a clever school-boy, and in life he proved that he had as keen an eye for the real as for the ideal. There is no doubt that he could see a man through and through ; and all that pertains to society,—national character, the tendencies of the collective mind, the under-currents of corporate life,—as little escaped his piercing gaze as the deep and subtle workings of the individual heart. He had not merely seen life ; he had felt its springs. We should not however be just to his memory if we failed to acknowledge

his leading moral characteristic,—independence. That is a quality rare in all times at all places, especially rare in Bengal, and becoming rarer every day. But Babu Bankim Chandra had it to perfection; not that fussy, histrionic hauteur which brings a man into difficulties and does no good, but a silent, determined firmness, which, while it surrenders not the will, avoids occasions of conflict. To Indian and Englishman alike he was unbending, not in pompous antagonism but in the easiest and most natural of ways.

There is no reason to regret that circumstances drove Babu Bankim Chandra to the drudgery of official life. Work, the active work of life, as distinct from the secluded passive industry of the student and the man of letters, is hardly ever an evil, often bracing. The literary man works with ideas, and ideas are never more true than when they are obtained from life, or corrected by it. Besides, the alternation of contemplation with action give the pause necessary to mental health and furnishes leisure for forming new images and storing up energy. Each is a rest relatively to the other. Furthermore, the end of Man, as has been said from ancient times, is an Action and not a Thought. If Bankim Babu has by his judgment and legal knowledge prevented an innocent man from being brought to the gallows or a murderer from escaping it, he should be held to have done at least as much good to the world as any one could do by writing a novel. From no point of view, therefore, are we disposed to be sorry for Bankim Babu's connection with the realities of life. Literature has been no loser by it; possibly it has been a gainer. It excluded the necessity of turning out "pot-boilers;" it widened the writer's experience and stimulated his ideas; it saved him from the dissipations of journalism and the coarse competition of a professional career; it brought him dignity. That a gentleman of powers so considerable

chose to write in Bengali, is fortunate for this province and its language. Our literature has been enriched ; the resources of our vernacular greatly expanded. It may be of some use to note that Babu Bankim Chandra wrote not with the set purpose of improving the Bengali language. His intention could have been no other than to produce good novels in that language ; and such improvement of the language as came about, was only incidental. That is always the way of reform. Nobody ever writes in order to improve a language. The writing can only be intended to please, instruct or persuade. If the language grows, its growth is an indirect result which never was consciously aimed at. We speak, of course, of men of letters, and not of lexicographers or grammarians. Shakespeare did not write Hamlet or Macbeth to improve a tongue. Probably, even after having written the plays he was not conscious that he had improved it. If the Bengali language or literature is to grow, it must grow in the same way and not by conscious efforts. A pertinent question in this connection is, what moral may we draw from Bankim Babu's experiences in the field of Bengali literature ?

Certain facts we take to be clear. No Bengalee could have written a novel in English as felicitous as Bankim Babu's Bengali. It is doubtful if even a great English writer could produce a novel of Bengali life in as good English, for there seems to be a correspondence between the life of a people and their language, and foreign sounds kill native life in the expression. If, however, novels of Bengali life could be written in fairly good English, they might secure the author some reputation among English-reading people, but they could never occupy anything like a high place in English literature. Their commercial success would depend upon circumstances. By electing to write in Bengali, Bankim Babu came to occupy the foremost place in our literature, established

a permanent source of income, imparted flexibility and refinement to our language, provided amusement and instruction to the classes that have no acquintance with English, and presented more life-like pictures of local life than could be drawn with a foreign pencil. The country and the author were alike gainers by the resort to the native tongue. These are facts which have a lesson to tell. The literature of life, that is, of national and not of universal life, is never properly written except in the nation's own tongue. But cosmopolitan literature, the literature of universal life and thought, of truths unconditioned by time and place, may, without prejudice to any interests, be embodied in any language. It is possible for a Bengali who has a sufficient mastery of English, to write works on philosophy, theology, science, and such other subjects, in that language, doing justice to himself and the cause he has espoused. Very different will be his position when he has to write a novel or a drama or a national epic. If he can excel in any literature properly so called, it can be only in the history and antiquities of his own country, or in a description of its life, or in translations from the native tongue into a foreign. That is the reason why natives of India, however gifted, have not produced any English literature worth the name; and, may we say, they never will produce it. The exceptions here prove the rule. If Dr. Rajendra Lala Mitra or Mr. Justice Telang, or Mr. R. C. Dutt has made any contribution to English literature, that has been the history or archaeology of this country. Whoever has sought to cultivate the mere literature of a foreign people, has failed to produce any literature himself. Russick Krishna Mullick, Govind Chandra Dutt, Girish Ghose, and, last not least, Sambhu Chandra Mukerjee, were devoted students of English literature. Their ambition was purely literary, but they could not and did not produce any literature save of the

ephemeral kind. They were working with unfit tools. Toru Dutt wrote excellent poetry, but not of the national sort. Shoshee Chunder Dutt and Kasi Prosad Ghose were competent English scholars and wrote exceedingly well, but their English literature, the only literature they wrote, cannot last. Rev. Lal Behari Dey's Gobindo Samanta may have some place in English literature only as a description of native live in Bengal by a Bengali. Literature of the abstract and universal sort may have a merit apart from style and life ; national literature can never dwell permanently in any habitat save one of the national language. Dr. P. K. Ray and Babu Ashutosh Mukerjee have done no harm to themselves or their subjects by the former writing his Deductive Logic or the latter his Conic Sections in English ; and Babu Bankim Chandra would probably have done well to write in English, or at any rate to produce an English version of, his Dharma-tatwa. But it would have been a fatal blunder for Bankim Babu or any other Bengali to have attempted the writing of novels or any other kind of pure literature, in English.

The admiration would be indiscriminate which would represent Bankim Babu as the greatest Bengali of modern times. He was great and indeed unapproached, in his own sphere, that of prose fiction, but the same towering eminence had been reached by other Bengalis in their own several spheres. 'Not in each but in all is human nature whole.' In the realm of letters alone, we are inclined to place two of our countrymen higher even than Bankim. They are Michael Madhu Sudan Dutta and Rajendra Lala Mitra. Datta was much inferior to Bankim in dramatic power, in knowledge of life, in insight into character. He was no thinker. But he was a poet, which Bankim was not. His muse was epic, not lyric or didactic. He had more originality and vigour, and, within his limits, did more creative work. He was more vivid

in imagery, more brilliant as a rhetorician. And it must be remembered he died a much younger man. Rajendra Lala Mitra also had not Bankim's penetration into human character and social problems, but his powers were more voluminous and varied, his reading was larger, his work in life more useful. His special gift lay in the interpretaion of the past and the reading, sifting and weighing of historical evidence. His literary work, therefore, has been of an exceptionally high order, more fit to receive the appreciation of scholars than of the people. But he lacked Bankim Chandra's philosophical capacity and we are sorry, no less for the man than for the country, that Bankim Babu's philosophical work should have been left in an unshaped, embryonic form. One work he would have been especially well qualified to execute, and that is a history of ancient civilisation in India. Mr. R. C. Dutt's work has many merits, but in the first place it exhibits a bias, and in the next, it is only an epitome of European learning. Mr. Dutt goes to his work in the spirit of a social reformer, and is only too anxious to point this or that preconceived moral. We should have likely to see our ancient civilisation read at first hand, that is through our own literature, by native eyes and interpreted by a native judgement, a judgement sympathetic if critical and duly alive to sense of relativity. Bankim Babu could have given us a work to our taste, but that satisfaction we are destined not to receive.

One lesson of Bankim Babu's life it would be unpardonable to ignore. The influences of western culture on the Hindu mind are not necessarily sterilising and denationalising. No Bengalee had drunk deeper draughts at the fountains of European thought and learning than Babu Bankim Chandra, no one was more anglicised in his habits of thought and modes of expression. His last paper on the Vedas has an English

terseness of expression, an English severity of reasoning, and an English humour. His novels are English in taste, in the construction of the plot, in the setting of character, somtimes to a fault. He was no imitator, but the moulds of his thought had come to be, by much reading and assimilation, English, and they imparted their stamp to all his productions. If parallels can be discovered to his plots, situations and characters in European literature, they do not prove lack of originality, any more than the parallels that have been discovered to some Milton's images and Tennyson's ideas. European culture may have a two-fold effect on the Hindu mind. It may crush native energy and breed a passion for western ideas and ideals, or else it may correct, refine and develop the endowment of nature, and stimulate a feeling of nationality. What effect will arise in a given case will depend on circumstances, chief of which are temperament, association, accident and the spirit of the times. For his preference of the Bangali as the language of his productions, he was indebted to the influence of Iswar Chunder Gupta. That we call an accident. His own temperament and the time-spirit turned his thoughts definitely to philosophy and religion in his mature years, but we should not be surprised if the bent was finally determined, if a mere philosophic interest was sublimed into a religious earnestness, by a particular domestic misfortune. Death is an awakener and can make prophets and saints.

Babu Bankim Chandra's views on religion and social philosophy seem to have been in the course of formation. It would not be fair to judge him in any adverse way by the fragments he has left. His Dharma-tatwa has all the appearance of prolegomena. Reading it between the lines we are inclined to suspect that in a few years more, the writer, continuing of course to be a Hindu in life, would have

embraced, as a doctrine, either Positivism or Theosophy. He concludes by accepting Comte's definition of Religion; his view of Culture as Discipline, not merely intellectual but social, is substantially Positivist in conception. At the same time, his insistence on the primal *brahma* would lead the Theosophists to claim him as their own. However that may be, we do not see our way to identifying Religion with Culture. Religion is Worship, or a worshipping state of the mind, and has to be directed to another than self. That other is, transcendentally, God; humanistically, Humanity. In either case, Religion is altruistic. Culture, on the other hand, however varied or complete, is essentially, egoistic. It is a cultivation, education, development, training or development of self. Bankim Babu uses the word in a sense wider than the current English sense, but though it may be understood as perfection, spiritual and moral, and embracing an ordered life, it cannot help being a state of self. Any mere condition of the self is not Religion, which can only mean a tending of the soul to a Being external to it. In the next place, Babu Bankim Chandra does not sufficiently insist on the Emotional element in Religion. That is an element insisted on in every view. The English apostle of Culture, Mathew Arnold, defines Religion as morality touched with emotion. Bankim Babu includes love and reverence in religion, but those feelings may be felt and practised as cold moral virtues, as mere duties, as discipline. It is not until they are kindled into the white heat of ecstasy that they become truly religious.

One of Bankim Babu's latest deliverances on the subject of social reform is to be found in his letter to Maharaj Kumar Binoya Krishna, on the subject of sea-voyages, from which we take the following significant passage :—

I venture to think that Hinduism is not exclusively confined within the Dharma Shastras. Hinduism is catholic in its scope.

in the hands of the saintly authors of the Smritis especially in those of the modern, Raghunandana and others like him, it has shrunk into narrowness. But the Hindu religion was not the creation of the Smarta sages. The Hindu religion is traditional and existed before them. It is nothing unlikely therefore that there should be occasional conflict between the traditional religion and the Dharma Shastras. Where we find such a conflict, we ought to prefer to follow the traditional religion. I do not admit the existence of any conflict between religion and the Hindu religion. If such a conflict existed there would be nothing in the Hindu religion to be proud of. If such a conflict existed it would not be entitled to its name of the Eternal Religion. No such conflict exists. Sea-voyages are conformable to religion because they tend to the general good. Therefore, whatever the Dharma Shastras may say, sea-voyages are conformable to the Hindu religion.

Without controverting any of these positions or meeting them with opposite statements of principle, we may raise the question, what is to be the standard, and who is to be our authority, for determining the means of social welfare ? Must it be left to individual discretion ? If not, what is to be our resource ? The practice in our country, probably in all civilised countries, has been to accept certain books as authoritative and certain interpreters as authoritative. Must private judgment take their place in Bankim Babu's system ? If so, what guarantees are there of order and uniformity ? The answer would have come in time, but is now unfortunately shut out for ever. It is clear that Bankim Babu, ardent and thorough-paced admirer of Hinduism as he was, did not pin his faith to the Smritis, did not want to have society hide-bound, did not claim omniscience for the Rishis, did not care to make Hinduism dependent on eating, did not proscribe travel, and would not allow any restrictions injurious

to the general well-being. Nothing that is inexpansive and unchangeable has lived, and as Bankim Babu was anxious that Hinduism should live, he desired its adaptation to changing ideas, and in particular, to the changing conditions of life.

No one should complain that a man so truly great, such a prince among men, was not duly honoured by the Government. Deputy Magistrates, Hindu and Mahomedan, have, before this, been Members of the Legislative council. Babu Bankim Chandra was not destined to be one of the select band. Others also have at times got prize appointments in and about Calcutta; none of those mercies were in store for such a one as Bankim. His highest official honour was a C. I. E. conferred on him only the other day. No one seems to have thought of him as a likely person for what has been called the Statutory Civil Service. An alien Government cannot know the best among the people except by chance. Babu Bankim Chandra Chatterjee could spare any honours that might come from such a quarter. He held a sceptre brighter, purer and for some purposes more potent than any that political rulers might wield. There is none to grasp it now. His countrymen treated him well in life, and they will only honour themselves if they now honour his memory. The great never die; their influence abides. Bankim Babu dead may render even greater service than Bankim Babu alive, for the sense of his loss may stimulate others to take up his work and follow in his wake. Let us hope that some shoulders, if not of one, at any rate of a party, will be found capable of bearing his mantle, and that the charm of his name will be a rallying point for a band of sincere and earnest workers.

The Indian Nation.
April 16th, 1894.

পরিশিষ্ট—২

RISHI BANKIMCHANDRA.

(By Aurobindo Ghose)

There are many who, lamenting the by-gone glories of this great and ancient nation, speak as if the Rishis of old, the inspired creators of thought and civilisation, were a miracle of our heroic age, not to be repeated among degenerate men and in our distressful present. This is an error and thrice an error. Ours is the eternal land, the eternal people, the eternal religion, whose strength, greatness, holiness, may be overclouded but never, even for a moment, utterly cease. The hero, the Rishi, the saint, are the natural fruits of our Indian soil ; and there has been no age in which they have not been born. Among the Rishis of the later age we have at last realized that we must include the name of the man who gave us the reviving *mantra* which is creating a new India, the mantra 'Bande Mataram.'

The Rishi is different from the saint. His life may not have been distinguished by superior holiness nor his character by an ideal beauty. He is not great by what he was himself but by what he has expressed. A great and vivifying message had to be given to a nation or to humanity ; and God has chosen this mouth on which to shape the words of the message. A momentous vision has to be revealed ; and it is his eyes which the Almighty first unseals. The message which he has received, the vision which has been vouchsafed to him, he declares to the world with all the strength that is in him, and in one supreme moment of inspiration expresses it in words which have merely to be uttered to stir men's inmost natures, clarify their minds, seize their hearts and impel them to things which would have been impossible to

them in their ordinary moments. Those words are the *mantra* which he was born to reveal and of that *mantra* he is the seer.

What is it for which we worship the name of Bankim to-day? What was his message to us or what the vision which he saw and has helped us to see? He was a great poet, a master of beautiful language and a creator of fair and gracious dream-figures in the world of imagination; but it is not as a poet, stylist or novelist that Bengal does honour to him to-day. It is probable that the literary critic of the future will reckon "Kopal Kundala," "Bishabriksha" and "Krishna Kanta's Will" as his artistic masterpieces, and speak with qualified praise of "Devi Chaudhurani" "Anandamath" "Krishna Charitra" or "Dharmatatwa." Yet it is the Bankim of these latter works and not the Bankim of the great creative masterpieces who will rank among the Makers of Modern India. The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation-builder.

But even as a poet and stylist, Bankim did a work of supreme national importance not for the whole of India or only indirectly for the whole of India, but for Bengal which was destined to lead India and be in the vanguard, of national development. No nation can grow without finding a fit and satisfying medium of expression for the new self into which it is developing without a language which shall give permanent shape to its thoughts and feelings and carry every new impulse swiftly and triumphantly into the consciousness of all. It was Bankim's first great service to India that he gave the race which stood in its vanguard such a perfect and satisfying medium. He has been blamed for corrupting the purity of the Bengali tongue; but the pure Bengali of the old poets could have expressed nothing but a conservative and unprogressing Bengal. The race was expanding and changing,

and it needed a means of expression capable of change and expansion. He has been blamed also for replacing the high literary Bengali of the Pundits by a mixed popular tongue which was neither the learned language nor good vernacular. But the Bengali of the Pundits would have crushed the growing richness, variety and versatility of the Bengali genius under its stiff inflexible ponderousness. We needed a tongue for other purposes than dignified treatises and erudite lucubrations. We needed a language which should combine the strength, dignity or soft beauty of Sanskrit with the verve and vigour of the vernacular, capable at one end of the utmost vernacular raciness, and at the other of the most sonorous gravity. Bankim divined our need and was inspired to meet it, he gave us a means by which the soul of Bengal could express itself to itself.

As he had divined the linguistic need of his country's future, so he divined also its political need. He, first of our great publicists, understood the hollowness and inutility of the political agitation which prevailed in his time and exposed it with merciless satire in his "Lokarahasya" and "Kamala Kanter Dafter." But he was not satisfied merely with destructive criticism, he had a positive vision of what was needed for the salvation of the country. He saw that the force from above must be met by a mightier reacting force from below. He bade us leave the canine method ot agitation for the leonine. The Mother of his vision held trenchant steel in her twice seventy million hands and not the bowl of the mendicant. It was the stern gospal of force which he preached under a veil and in images in "Anandamath" and "Devi Chaudhurani." And he had an inspired unerring vision of the moral strength which must be at the back of the physical force. He perceived that the first element of moral strength must be Tyaga, complete self-sacrifice for the country and complete self-devotion to the

work of liberation. His workers and fighters for the mother land are political Bayragees who have no other thought than their duty to her and have put all else behind them as less dear and less precious and only to be resumed when their work for her is done. Whoever loves self or wife or child or goods more than his country is a poor and imperfect patriot; not by him shall the great work be accomplished. Again, he perceived that the second element of the moral strength needed must be self-discipline and organisation. This truth he expressed in the elaborate training of Devi Chaudhurani for her work, in the strict rules of the Association of the "Ananda Math" and in the pictures of perfect organisation which those books contain. Lastly, he perceived that the third element of moral strength must be the infusion of religious feeling into patriotic work. The religion of patriotism, this is the master idea of Bankim's writings. It is already foreshadowed in "Devi Chaudhurani." In "Dharmatattwa" the idea and in "krishna Charitra" the picture of a perfect and many-sided Karma Yoga is sketched, the crown of which shall be work for one's country and one's kind. In "Anandamath" this idea is the key note of the whole book and receives its perfect lyrical expression in the great song which has become the national anthem of United India. This is second great service of Bankim to his country that he pointed out to it the way of salvation and gave it the religion of patriotism. Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political guru.

The third and supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother. The new intellectual idea of the motherland is not in itself a great driving force; the mere recognition of the desirability of freedom is not an inspiring motive. There are few Indians at present, whether loyalist, Moderate or Nationalist in their political views, who

do not recognize that the country has claims on them or that freedom in the abstract is a desirable thing. But most of us when it is a question between the claims of country and other claims, do not in practice prefer the service of the country; and while many may have the wish to see freedom accomplished, few have the will to accomplish it. There are other things which we hold dearer and which we fear to see imperilled either in the struggle for freedom or by its accomplishment.. It is not till the motherland reveals her self to the eye of the mind as something more than a stretch of earth or a mass of individuals, it is not till she takes shape as a great Divine and Maternal Power in a from of beauty that can dominate the mind and seize the heart, that these petty fears and hopes vanish in the all absorbing passion for our mother and her service, and the patriotism that works miracles and saves doomed nations is born. To some men it is given to have that vision and reveal it to others. It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song and few listened; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bande Mataram. The Mantra had heen given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The mother had revealed herself. Once that vision has come to a people, there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple has been made ready, the image installed and the sacrifice offered. A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror.

April 16th, 1907.

College Press, Calcutta.

—তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ

বহুমানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

বাঙ্গলা সাহিত্যে নানা বিষয় সম্বলিত উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ পুস্তকের প্রচার বিরল না হইলেও—আশানুরূপ নয়। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীকরণার্থ আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক কতিপয় খ্যাতনামা প্রফেসর ও সাহিত্যিকগণের পরামর্শ ও নির্দ্দেশক্রমে আমরা সুলভে সৎসাহিত্য প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের সঙ্কল্প,—নীতি ও রুচিসঙ্গত, প্রীতিপ্রদ, মনোজ্ঞ উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণের জীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত. বৈজ্ঞানিকতথ্যপূর্ণ জনপ্রিয় পুস্তক সকলও (Books on Popular Science & Nature study) প্রকাশ করিব।

সঙ্কল্পের তুলনায় আমাদের শক্তি অতি সামান্য—ভরসা আপনার সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি। আশা করি আমাদের সিদ্ধির পথে আপনি আমাদিগকে উৎসাহ দানে বিমুখ হইবেন না। আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া যদি অভয় দেন আমরা আপনার নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিব ও ক্রমশঃ প্রকাশিত পুস্তকগুলিও পাঠাইয়া দিব।

আপনার ন্যায় সাহিত্যরসজ্ঞ সহৃদয় মাতৃভাষার সেবককে অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

বিনীত—

মুখার্জ্জী, বোস এণ্ড কোং